KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7·5" x 6"
Vol. & Number : 7/8 7/9 7/10	Year of Publication : অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ফাল্গুন ১৩২৭ বৈশাখ ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বাঙালী-পেট্রিয়ট

(জনৈক বন্ধুকে লিখিত)

—:*:—

আজ বিজয়া। এই শুভ দিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভ-কামনা করাটা আমাদের মধ্যে আবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইংলণ্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্রসমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এদেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার, হয় প্রণাম নয় আশীর্ব্বাদ জানানো, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলি হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারীর সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলে ত জানি নে, যদি থাকে ত সে এত দূর সম্পর্ক যে, তা না থাকারই সামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন, তিনশ' পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিনশ' চৌষট্টি ছাড়া আর একটা দিন, অর্থাৎ—এ দিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনও দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয় না। এই একটি মাত্র দিনেই

আমরা বাঙালীরা বিশেষ ক'রে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালী, তার উপর আবার শাক্ত-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালক কাল হতে সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব চাইতে বড় উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এই সকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংশ্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবোনা যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রথমত ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা আজও কেউ নির্দ্ধারণ ক'রে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষত অর্ব্বাচীনের মনের পক্ষে। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পারো যে, দুর্গা-প্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ আমি আরতির সময় মাটির প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সে-কালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণকর্ত্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্য্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবী। বরদে। ভুবনত্রয়েপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি সে "সমর-নিষ্ঠুরতার" নয়, চিত্ত-কৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে ও সব হচ্ছে illusion আর delusion. অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। আজীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, একরকম delusion-এর হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে আর এক রকম delusion-এর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়ে আর এক ঠাকুরের পুজো করতে সুরু করি। তা ছাড়া যে সকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সে সকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাঁটা ছাঁটা হিরকখণ্ডের মত নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্টভাব। আর আমাদের মতামত কার্য্যকলাপের উপর এই সকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড় কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ তা অলক্ষিত। আমার এ সব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে, আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা, সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হটলেই এমন জায়গায় পৌঁছনো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমা-ভক্তি উড়ে যায়। "ন প্রতিকে ন হি স"

এ সূত্র ত বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ যুগে আমরা সবাই বৈদান্তিক, অর্থাৎ—আমরা ধর্ম্ম মানি, কিন্তু কোন ধর্ম্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলত বাঙালী। বাঙালী হিন্দুর মনের ধর্ম্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালীর চিরাগত ধর্ম্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথায়ও দুর্গোৎসব জাতীয়উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্ত্তি-পূজার প্রসাদেই বাঙালী জাতির মনের poetic এবং æsthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনও ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু, তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শন বিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের কাছে তা শিব বলে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর বলে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খ ঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম্ম যাই হোক না কেন, বাঙালীর জাতীয়পূজার প্রভাব বাঙালীর সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালীর হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পারো যে, আমি এ উৎসবের একটি কলঙ্কের কথা, বলিদানের কথা চেপে গিয়েছি। ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনও সভ্য জাতি করে না। আর এ হত্যা যে, যেমন অনর্থক তেমনি বর্ব্বর, আজকের দিনে কোনও শিক্ষিত বাঙালী তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগ-শিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমর নিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করছেন—তাঁদের পৌরুষের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাকযুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যারা বৈদিক তান্ত্রিকসমাজে মানুষ হয়েছে, সে সকল বাঙালীর পক্ষে জবাফুল চক্ষুঃশূল নয়, আর রক্তচন্দনের ফোটায় তাদের কপালও চড় চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে মানুষের জীবন-রাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুই রকম সুরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকল প্রকার রাজসিক ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম্ম সহিত্যেরই হোক, আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয়, অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

(২)

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়ৎটি

আজ সুদ-শুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কংগ্রেসের পিঠ পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি, কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনো যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালী-প্রেট্রিয়টিজম। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালী-পেট্রিয়টিজমকে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয়, তাহলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাঙলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজমের প্রত্যাশা কর? আমি যে ইংরাজি লিখিনে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অবঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোন দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোন দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কংগ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক্, কোনরূপ ভালবাসার-কৈফিয়ৎ চাওয়াও যেমন অন্যায়, দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই

হোক। এ স্থলে বলে রাখা ভাল যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতি-প্রীতি। দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ, কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক্ ও সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতি-প্রীতির কৈফিয়ৎ কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও-হচ্ছে মনের একটা দুর্ব্বলতা। স্বজন-বাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য যখন অর্জ্জুনেরও ছিল তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর বাঙালী বাঙালী মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ—ভাষার যোগ হচ্ছে, মানস কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালীদের পরস্পরের প্রতি নাড়ীর টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পূরো কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলে বেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কসতে দিতেন, যা আমরা সকলে কসে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই ঃ—

"আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ
তেহাই সলিলে তার,.....

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর

কতটা পোঁতা আছে আঁক কসে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্ব্বত প্রমাণই হোক আর বল্মিক প্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরের তরল ভাবে ডুবে আছে, যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে সব তর্কযুক্তি দেখায় সে সব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্ম্মিক, উপরন্তু মহা পেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে?

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে আমি আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম সমর্থন করে, তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। 'সবুজপত্রে' তোমার অনুরোধ মত

আমার কৈফিয়ৎ-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ, সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" সেই ভাবে আমার কৈফিয়ৎ তোমার পত্রের অনুচর হ'য়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশ লাভ করবে, তাহলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি-বুদ্ধি মেজে ঘসে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম, যাতে সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দিতে পারতেন না।

(৩)

সংস্কৃতে বলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি' কিন্তু ইংরাজিতে বলে, 'it is never too late to mend', আমি ইংরাজি-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরাজি বচন শিরোধার্য্য ক'রে, এ কৈফিয়ৎ লিখতে বসেছি এই আশায় যে সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ—আগামী স্বরাজের, lingua franca-য় প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র, একদণ্ড, ইংরাজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচথেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত ইংরাজি-শাসিত স্কুল কলেজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে, আমি হয়ে উঠেছি একজন neo-Indian ওরফে non-Indian, অর্থাৎ—কংগ্রেস-ওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি,

আর ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের স্বপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে ত তাই বলব। বাঙালী পেট্রিয়টিজমের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations-এর মতানুসারে বাঙালী-পেট্রিয়টিজমের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের self-determination বিরোধী হচ্ছে Indian Imperialism. আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, Imperialism সর্ব্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরাজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে জর্ম্মাণীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্ম্মাণীর এই স্বদেশী imperialism, জর্ম্মাণ জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বলো যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে self-determination যদি না খাটে ত ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোন জাতির সঙ্গে অপর কোন জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাঙলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক

দলের পলিটিসিয়ানরা আঁতকে ওঠেন তার কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে, কোনও মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষিরে বঞ্চিত করছেন তাহলে সে অভিযোগের কি কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো যদি কোনও জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ যোগাতে ব্রতী হন, তাহলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস আমাদের পলিটিসিয়ানরা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

(৪)

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন?—তার উত্তর আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনও প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্ম্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে

সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিম্বা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্ম্মের চর্চ্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসী-ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া, আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসী-মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয় বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজম গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি ঃ—

"অস্তি গোদাবরি তীরে বিশাল শাল্মলী তরুঃ। তত্র নানা দিগ্দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষীনঃ নিবসন্তি স্ম।" রাত্রিকালে নানা দিগ্দেশ হতে পাখীরা এসে গোদাবরী তীরে সেই শিমুল গাছে জড় হত কেন?—

কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষী-সভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও যে ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কংগ্রেসে গিয়ে দিন তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও ঐ একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরাজ-দত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসি-পেট্রিয়টিজমের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক। আর আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশী-শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে, আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক know thyself এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

(৫)

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র

আমাদের চোখের সুমুখে ধন-ধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ ত হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী ও প্রাণের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাই-ই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড় কথা হচ্ছে capitalism, এবং bolshevism বাদবাকী আর যত রকম 'ism' আছে সে সবই হয় capitalism নয় bolshevism-এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম্ম এতই পরস্পর বিরোধী যে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবন-মরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিক্যাল ধর্ম্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানব জাতি যে দুভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। Capitalism-এর মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহুঅন্ন আর bolshevism-এর মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনটিই টিঁকবে না। কেননা Capitalism ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর bolshevism মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ—মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের

সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও, তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র স্বরীতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই ত মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙ্গল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই, জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই, তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের nationalism এর নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের nationalism-এর বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি তখন বুঝতে হবে যে আমরা nationalism শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনও জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনও ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর materialist, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mind-ও matter-এর মত দেশের গণ্ডীতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার

স্বেনামিতে জড়বাদ, যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক-স্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্ন-সমস্যার সমাধান করা। আর বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান স্বাপেক্ষ। কথার রাজ্যথেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশশাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম। যে রুসোর পলিটিক্যাল মতামতের ঘসা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজমের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজমকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে আনতে হয়।

সে যাইহোক আমার বাঙালী nationalism মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট হবার একটি উপায়মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬)

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা

বাঙালীর national-self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national-self-consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশীযুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তরজামা করা চলে না।

মানুষমাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা-দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে

বাঙলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনও জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প বিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না-মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল-মতামত যে, 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ ত সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল-আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার-ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্য বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hern-এর বইয়ে পড়েছি যে সেক্সপিয়ারের নাটক—জাপানিদের মনের কোনখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে সেক্সপিয়ারের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয় ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে, ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যান ধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব-নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙালী-যুবক Einstein-এর নবাবিষ্কৃত আলোক-তত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্ম্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলায় জগদীশ বসু প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালীর জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের

প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুগ উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উক্ত শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষা দীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা না একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজত্ব বলে কোনও জিনিস নেই; অথবা সে নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায় তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বস্বস্বাব্যস্ত করবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া-মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিক্যাল-মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যাল-মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না, যদি মানতেন তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবক শ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহু-বাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জ্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব, আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে কতকটা পরীক্ষার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ। এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতি-বিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে, আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নব-

শক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয় এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে। এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা—উপাধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে পাই মহা কঠিন ; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ—কৃতী হওয়া। জীবনের কাছথেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন, কেননা এ লড়াই চিরজীবন ব্যাপী, এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিকসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছি, সুতরাং আমার কাছথেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে, তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজ কাল যে সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে, অজ্ঞতা আর ঔদাসিন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে আমার মন এ যুগের বাঙলার মন। যদি তাই হয় তা বাঙালীর nationalism-এর আদর্শ যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন

পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা, কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়। নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়, প্রার্থনা বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice-এর কথা নেই, তার উত্তর আমি দেব, self-sacrifice কোনও জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation. আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহুলোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে-দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়, ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ—যে-বাঙলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে-ন্যাসনালিজম বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রামমোহন রায় ও যুগধর্ম্ম

—:*:—

রাজনৈতিক শান্তির ছায়ায় বাঙালার পল্লিগ্রাম যখন ছেয়ে পড়েছিল তেত্রিশ কোটী দেবতার বিগ্রহে এবং পরাধীন নরনারীর চিত্ত যখ নঅভিভূত হয়েছিল পারলৌকিক সদ্‌গতির লোভে,—উনবিংশ শতাব্দীর বয়ঃসন্ধিকালে রামমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল সমাজের সহিত সদ্‌ভাব নিয়ে। বিশ্ব-সভ্যতার বীজ এইরূপেই অখ্যাত অজ্ঞাত এক বাঙালীর চিত্তে রোপিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষ কি এর জন্য প্রস্তুত ছিল? রাজপুতনায়, দাক্ষিণাত্যে শান্তি তখনও স্থাপিত হয় নি, মারহাট্টার দস্যুতায় মেবার মরুভূমি হচ্ছিল, পিণ্ডারীদের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম থেকে বেষ্টন করে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য কলিকাতার কোম্পানী বাহাদুর রাজপুতনার রাণা মহারাজকে আহ্বান করেছিলেন, ভারতে শান্তি স্থাপনের জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অফ্ হেষ্টিংসকে দুইলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

রামমোহন যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন ফরাসীবিপ্লব ধীরে ধীরে বৈশাখের উত্তাপের মধ্যে ঝটিকার ন্যায় জন্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছিল; ফ্রান্সের কবি, বৈজ্ঞানিক মধ্যযুগের সভ্যতাকে প্রকৃতির ধর্ম্মাধিকরণে অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচার করছিলেন; রুসোর, ভল্টে-

য়ারের লিপিকুশলতায় তার অপরাধও প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল; দেশ হতে নির্ব্বাসন এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাও ঘোষিত হয়েছিল; উৎপীড়িত ফ্রান্স পৃথিবীর সকল জাতি, সকল সমাজ, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা-অঙ্কিত তিন রংঙা পতাকার ছায়ায় আহ্বান ক'রে এক বিশ্বসমাজ গঠন করতে চেয়েছিল যার অবাস্তব মন্দিরের কুহেলিকাচ্ছন্ন তোরণদ্বারের শীর্ষে মানবজাতির উত্তপ্তশোণিতে লেখা ছিল,—Patriotism.

রামমোহন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ইংরাজের অধিনায়কত্বে য়ুরোপের নৃপতিগণ মধ্যযুগের feudalism-কে য়ুরোপে আরো একশত বৎসর প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য ফরাসী জাতির তিন রংঙা পতাকাটিকে ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে সত্তর আশী হাজার মানুষের এক রংঙা রক্তে ছুপিয়ে জয়োল্লাস করছিল;—য়ুরোপ তখন বিশ্ব-সভ্যতার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

মার্কিন-সভ্যতা তখনও কালের গর্ভে বিলীন ছিল; এমারসন, থিয়োডর পার্কার তখনও বিশ্বগুরুর পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম ভাগ শিখছিলেন।

ইতিহাসের এই দুর্য্যোগ-রাত্রিতে সামাজিক অধীনতা, রাজনৈতিক অশান্তি, বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিচ্ছেদকালে রামমোহনের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল—"ভাব সেই একে"। তাঁর জীবনেই প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য, বিশ্বহিতেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রকৃতির এতদিন অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার হতে যে সকল অসংখ্য শক্তি আবিষ্কার করেচে, তার মধ্যে এই

সবার চাইতে প্রধান আবিকার বলে মনে হচ্চে—জনসমাজের,—গণ-তন্ত্রের ইচ্ছা। ভারতবর্ষের পৌরাণিকযুগে এবং য়ুরোপের মধ্যযুগে ইচ্ছা প্রকাশ হত এক একজন কর্ম্মীর অন্তরে ন'মাসে ছ'মাসে, এ দেশে সে দেশে। মধ্যযুগের ইতিহাসে মহারথী ভূস্বামীগণের জীবনকাহিনীই দেখা যায়, জনসাধারণের ইচ্ছার রাঙিমা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ফুটে উঠতে দেখা যায় না; কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এঁরা কোনো না কোনো ভূ-স্বামীর আশ্রয়ে থাকতেন,—মাটীর মালিকই ছিলেন সভ্যতার মেরুদণ্ড।

কিন্তু যে যুগের প্রবর্ত্তক রামমোহন এবং গত এক শত বৎসরে যে যুগ এখনও পূর্ণ-যৌবনকাল পেয়েচে বলা যায় না, এই যুগের ইতিহাসে প্রথমেই চোখে পড়ে গণ-তন্ত্রাবলম্বী ব্যক্তির ইচ্ছা; এক দিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা, অন্যদিকে বিশ্বমানবকে জ্ঞান দেবার, আনন্দ দেবার, অত্যাচারীর হাত থেকে উৎপীড়িতকে রক্ষা করবার অহেতুকী আকাঙ্ক্ষা। গত মহাযুদ্ধে এই নব আবিষ্কৃত ইচ্ছা-শক্তিরই জয় হয়েচে। ব্যক্তির এবং জাতির ব্যক্তিত্ব এখন আর সম্রাটের, ষ্টেটের, ধর্ম্মযাজকের, কিম্বা দেশাচার, লোকাচারের অধীন নয়। সকল দেশে এই ইচ্ছা জেগে উঠেচে, ইচ্ছা সকলরূপেই মঙ্গল-কারিনী।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার রামমোহন সেই ইচ্ছাকে পরিচালনা করেছিলেন বিশ্বাত্মার, বিশ্ব-সভ্যতার দিকে, তার কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন সসাগরা ধরণী।

ইংরাজের অধিনায়কত্বে আজ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়েচে। কিন্তু ভক্তিহীন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানহীন ভক্তি, ধর্ম্মযাজকগণের কুসংস্কার

বিশ্ব-সভ্যতাকে সোজাপথে চলতে এবং সমানভাবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে এখনও বাধা দিচ্চে। রাষ্ট্রীয় বৈরী-বুদ্ধি মানুষকে এখনও বিচ্ছিন্ন করে রেখেচে, কাচের খেলানা দুনিয়ার বাজারে বিক্রী করে ধনী হবার জন্য স্বাধীন জাতিগণের মধ্যে রেষারেষি এখনও চলচে; ব্যক্তির অহঙ্কার বিশ্বাত্মার আলোককে স্বচ্ছ পথে সোজা-ভাবে এখনও আসতে দিচ্চে না।

সেইজন্য মনে হয় রামমোহনের জীবন-কাহিনী শ্রবণ মনন করবার সময় এখনও যায় নি। কেননা তাঁর সাধনার ভিতরই আমরা দেখতে পাই গণ তন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য।

(২)

ইতিহাসে দেখা যায় সকল ধর্ম্মই প্রচার হয়েচে কোনো-না-কোনো শক্তিশালী রাজশক্তির আশ্রয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে প্রচার হয়েছিল অশোক, কণিস্কের দ্বারা; খৃষ্টধর্ম্ম রোমসম্রাটের, ইস্‌লামধর্ম্ম খালিফের দ্বারা। ইংরাজ রাজ-শক্তির সহিত এই যুগ-ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; ইংরাজ রাজশক্তির শান্তিময়ী ছায়ায় ইহার উৎপত্তি, গত পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজি ভাষার সাহায্যে এই নবধর্ম্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে য়ুরোপে, এ্যামেরিকায় প্রচার হচ্চে। এই বাহনকে কি করে এই যুগধর্ম্ম ত্যাগ করবে? এটি আমাদের মনে রাখতেই হবে।

(৩)

এই প্রবন্ধে রামমোহনকে ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে নব-যুগপ্রবর্ত্তক-রূপেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে রামপ্রসাদের নামোল্লেখ

না করলে আমাদের ধর্ম্মসাধনার যে ঐতিহাসিক ধারা মাঝে মাঝে উত্তরমুখী হয়েও একটানা বয়ে আসচে, তা' অস্বীকার করা হবে। সংসারে কিছুই চিরদিন থাকে না—ইহাই সংসারসম্বন্ধে সত্য কথা নয়; কেননা আমরা এখনও দেখচি অতীতের ইতিহাস আমাদের কাছে এখনও বিলুপ্ত হয় নি। রামপ্রসাদের গান এখনও আমাদের হৃদয়মনকে আঘাত করে, আলোড়িত করে। সংসারীর কাছে অতি তুচ্ছ কাজ করতে করতে তাঁর ভক্ত-হৃদয় গান করে উঠেছিল—

"ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে॥"

পৌরাণিক যুগের আড়ম্বর-দেবতার হৃদয় সেই দিন সন্ত্রাসিত হয়েছিল যে দিন রামপ্রসাদ জমিদার বাবুর দোল দুর্গোৎসবের হিসাব মিলাতে মিলাতে গান করেছিলেন—

"জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা, জানবে না রে জগৎ-জনে॥"

যে দিন প্রমীত পশুগণের শোণিতে বালক যুবাদের নৃত্য করতে দেখে ভক্ত-কবি আক্ষেপ করেছিলেন—

"মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী, জয়কালী বলে বলি দাও ষড়-রিপুগণে॥"

সেই দিনই পৌরাণিক যুগ বিদায় নিল। আমাদের রামপ্রসাদ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হয়েই সেই যুগকে বিদায়পত্র দিয়েছিলেন।

রামমোহন বিধাতার অনন্তঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার হতে আর একটি নব-যুগ আনলেন। ক্ষণিকের জন্য উত্তরমুখী ধারাকে আবার দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিলেন। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

(৪)

আমাদের সাহিত্যে রামপ্রসাদের গানগুলি কিরূপ? প্রথমত তাঁর সুর এত সহজ যে সে গান শেখবার জন্য কালোয়াতের দ্বারস্থ হতে হয় না। আর্টের যদি উদ্দেশ্য হয় ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের হৃদয়কে অভিভূত করা আনন্দে বিহ্বল করা, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে রামপ্রসাদের ন্যায় সফলতা অল্প কবিই পেয়েছেন।

নবযুগ এবং পৌরাণিক যুগের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি যে গান গেয়েছিলেন তা অতি নির্ম্মল, অতি তরুণ শিশুকণ্ঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে "মা" "মা" ধ্বনির ন্যায়।

(৫)

যে সময়ে সমাজ অশন বসনের, এমন কি গৃহনির্ম্মাণ গৃহপ্রবেশেরও নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল, (রামমোহনের পথ অনুসরণ করলে দিয়েছিলেন বলাই উচিত) যে সময়ে রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে আত্মোন্নতির, সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি সজাগদৃষ্টি, সমাজের হিতাহিত চিন্তা অপ্রচলিত এমন কি অকর্ত্তব্যও ছিল, সেই সময়ে আমরা রামমোহনকে চিন্তা করতে দেখি, স্বজাতীয় সমাজ-পরিচালকগণের হাতে-গড়া বিধি-ব্যবস্থাকে পরীক্ষা

করতে দেখি তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ থেকে তিনি যে প্রতিমাকে ধর্ম্মপরায়ণা জননীর শিক্ষায় সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনী দেবী জ্ঞান করতেন, নিষ্ঠাবান পিতৃদেবের আদেশে নির্ম্মল সলিলে স্নান ক'রে, পট্টবাস পরিধান ক'রে প্রশস্ত ললাট চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে যাঁর চরণে বাল্যকাল হতে অর্ঘ্য দিতেন, তিনি তাঁর ষোড়শবর্ষে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করবার সময় হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করলেন না ; একটা অভাব অনুভব করলেন ; প্রতিমার খড় মাটি তাঁর ভক্তিতে আঘাত দিতে লাগল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা তিনি সেই সময়েই হৃদয়ে অনুভব করলেন ; ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি যা' লিখেছিলেন তা' তাঁর পিতার নজরে পড়ে ; ঐ সূত্রে পিতা পুত্রে অন্তরের বিচ্ছেদ ঘটল ; পিতার আদেশে এবং জ্ঞানের পিপাসায় তিনি তাঁর পিতৃগৃহ হতে বহিস্কৃত হলেন।

(৬)

মুমুক্ষু মানুষ সত্য চায়, শিল্পী মানুষ সুন্দর প্রতিমা চোখে দেখতে চায়, কর্ম্মী মানুষ স্বাধীনতা চায়। প্রতিমা-কল্পনায় আমাদের কলা-বিদ্যার এবং শিল্পচাতুর্য্যের চরম উন্নতি হয়েছিল, অদ্বিজ হিন্দুগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সহজ উপায় হয়েছিল কি ধর্ম্মচেতনা অধোমুখী হয়েছিল, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ এখনও চলচে। তর্কের দিক থেকে না দেখে ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য রামানুজ রামমোহন রামকৃষ্ণ পরমহংস—এঁরা সকলেই প্রতীকোপাসক সমাজের গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। জাতির ধর্ম্মচেতনার সহিত এঁদের ধর্ম্মসাধনার নাড়ির যোগ নেই, এটা যুক্তি-

তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ। যাঁরা বলেন বাইবেল হতে, কোরাণ হতে, একেশ্বরবাদের আলোক এঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এঁদের এল কেন ?

(৭)

ভক্ত কবির চিদাকাশে বিশ্ব-শক্তির প্রথম প্রতিবিম্ব স্মরণাতীত অতীত কালের যে মুহূর্ত্তে পড়েছিল, তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে ; ভারতবর্ষে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে। কত শিল্পী সেই চিন্ময়ী শক্তি দেবীকে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে গড়বার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু সে সময়েও তাঁদের মন থেকে একটা আক্ষেপ উঠেছিল—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রামমোহন অসহিষ্ণু উদ্ধত যুবকের ন্যায় দালান-আলো-করা প্রতিমাকে গায়ের জোরে অকালে বিসর্জ্জন দিতে চান নি ; তিনি খড়-মাটির বহিরাবরণ ভেদ করে সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। খড়-মাটি জলে গ'লে যায়, কিন্তু শিল্পীর মানস-পটে বিশ্ব-শক্তির যে প্রতিবিম্ব প'ড়ে বিশ্বরূপ ধারণ করে

তা ত সহজে মুছে যায় না। "ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রমে" দেখতে পাই—

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়

তিনি স্তবটিকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে যেমন পেয়েছিলেন, সেইরূপই গ্রহণ করেছিলেন। সাধকগণ হৃদয় মন উন্মুক্ত রাখেন বলে অল্প বিস্তর সকলেই কবি হয়ে থাকেন; বিশ্বশক্তি সৃষ্টির তরুলতা নদ নদীকে যেমন, তাঁদের মনকেও সেইরূপ আঘাত করে, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণাকে, রূপজ্ঞানকে জাগিয়ে দেন। অনন্ত আকাশে এই বিশ্বশক্তি শতদল পদ্মের ন্যায় ভাসচে, কত শক্তির তরঙ্গ কত দিক হতে এসে এই পদ্মটিকে যুগে যুগে ফুটিয়ে তুলচে। এই বিশ্বশক্তিসম্বন্ধে ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, এর আমরা কতটুকু জানি! অতীতকালের ইতিহাস, আমরা অমাদের দেহের গঠনে, মনের বিকাশে, আচার অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে বহন করচি, পঞ্চভূতের বড় বড় অবিকৃত শক্তির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রতি মুহূর্ত্তেই রয়েচে, অথচ সৃষ্টির নব নব পর্য্যায়ের বিচিত্র ঘটনার ইতিহাস আমরা কখনই মনে আনতে পারি নে। তাহলে একজন এমন নিশ্চয়ই আছেন যিনি বিশ্বজগতের অতীত কালের সকল ঘটনা এখনও নির্নিমেষ নেত্রে দেখচেন। তাঁর নিকট কিছুই অতীত হতে পারে না। এবং তিনি আমাদের ধ্বংসও ইচ্ছা করেন না। যে বর্ত্তমান বিচিত্র রূপে আমাদের জ্ঞান তৃষ্ণা, কর্ম্মচেষ্টা, ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলচে, আমাদের চিত্তকে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত করচে, যার আদি আজীবন চেষ্টা করলেও জানতে পারি নে,

যার অন্ত সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করেও অনুমান করতে পারি নে—স্থান হতে স্থানান্তরে শক্তির তরঙ্গ বয়ে যাওয়াতে যার আকৃতি দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্চে, যেখানে জড়তা সেখানে প্রাণসঞ্চার করচে, যেখানে অবসাদ সেখানে বলে দিচ্চে, যে বর্ত্তমান মৃত্যুকে স্বীকারই করে না—এই আশ্চর্য্য রহস্যময়, আকারে বর্ণে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দুর্জ্ঞেয়—অবশ্য একজন আছেন যিনি এই বিরাট বিশ্বশক্তির উত্থান পতনের লীলা নির্নিমেষ নেত্রে দেখচেন। আমাদেরই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তিনি সকল প্রকার ভোগের বস্তু এনে দিচ্চেন—তিনি স্নেহময়ী জননী। যে সুদূর ভবিষ্যৎ কুহেলিকার মত এই বর্ত্তমানের প্রান্তে রয়েচে, যার সুন্দর তরুণ আবছায়া মূর্ত্তিটি দেখলে আমরা দুঃখ ভুলে যাই, শোক ভুলে যাই, অথচ যে ভবিষ্যৎ আমাদের তৃষ্ণার্ত্ত মুঠো এড়িয়ে চিরকাল দূরেই থেকে যায়—অবশ্য একজন আছেন যাঁর নিকট ঐ ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত নয়। জন্ম মৃত্যু উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে প্রাণী নানা যুগের ইতিহাস বহন করে যাঁর অঙ্গুলি-চালনায় লীলাভিনয় করচে, আর্য্যসভ্যতার শিল্পী তাঁরই প্রতিমা গড়ে গেছেন শস্য-শ্যামল পল্লিগ্রামে দশপ্রহরণধারিনী ত্রিনয়না মহামায়া রূপে; তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রতীরে হস্তপদহীন জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিতে।

সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়বার আকাঙ্ক্ষায় চির-চঞ্চল শিল্পী মানুষের ধর্ম্মতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করবার জন্য আরাধ্য দেবতাকে এইরূপেই সকলের সুমুখে ধরে থাকেন। রামমোহন বিশ্বাস করতেন মানব হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সত্য, তিনি ধর্ম্মপ্রচার করবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা হতে এ স্পষ্টই বুঝা যায়। ব্রাহ্মসমাজের

Trust Deed-এ সেই জন্যই তিনি স্পষ্ট নিষেধ করে গিয়েছেন যে, "no object animate or inanimate that, has been or is or shall hereafter become or be recognised as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said Messuage or Building.....the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds." এ যে তাঁর পরিণত বয়সের ফল তা' নয়; অল্প বয়সে পারস্য ভাষায় তিনি যে প্রবন্ধ (Tuhfatul Muwahhiddin) লিখেছিলেন, তাতে আমরা তাঁর এই উদার মত দেখতে পাই।—

"Although each individual without the instruction or guidance of anyone, simply by *keen insight into, and deep observation of*, the mystiries of nature such as different modes of life fixed for different kinds of animals and vegetables and propagation of their species and the rules of the movements of the planets and stars and endowment of innate affection in animals towards their offspring without expecting any return, and without knowing the conditions which favour the growth and decay of the mineral, vegetable and animal kingdoms, has an *innate faculty* in him by which he can infer that there exists a Being who (with His wisdom) governs the whole universe; yet *it is clear* that every one in imitation of the nation in which he has been brought up, *believes the tenets of that creed in their entirety*."

উক্ত প্রবন্ধের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন—"I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands and found the inhabitants thereof agreeing generally in believing in the personality of One Being who is the source of all that exists and its governor, and disagreeing in giving peculiar attributes to that Being and in holding different creeds consisting of the doctrines of religion and precepts of *hárám* (forbidden) and *hálál* (lawful). From this Induction it has been known to me that *turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind equally*."

(৭)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে, মানুষের মূর্ত্তিগড়া স্বভাবটিকে নিয়ে তাঁরা যে কেবল বিব্রত হয়েছিলেন তা-ই নয়, মতান্তর হতে

মনান্তর, দলাদলির সৃষ্টিও ঐ উপলক্ষে হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতাকে একদিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, আর একদিকে সত্য পথ দেখিয়ে দিতে হবে, রামমোহন-প্রবর্ত্তিত নব-যুগধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য, রামমোহন দেখেছিলেন, পৃথিবীতে চিরকালই থাকবে; মানুষের মন গঠিত হয় তার স্বদেশের জলবায়ুর দ্বারা, স্বদেশের ইতিহাসের দ্বারা, তার স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার দ্বারা, তার স্বোপার্জ্জিত সফলতার দ্বারা।

মুমুক্ষু মানুষ, শিল্পী-মানুষ, কর্ম্মী মানুষ বিভিন্ন পথ ধরেও একই গন্তব্যস্থানে স্বাধীনচিত্তে যেতে পারে, নবযুগের জ্ঞানী, শিল্পী, কর্ম্মী-গণের জীবনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বজগতেরই ন্যায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(৮)

তরুণ যুবক রামমোহনের আধ্যাত্মিক তৃষা প্রতিমার খড়মাটি হতে বয়ে-আসা চরণামৃত পান করে সে বৎসর শান্ত হল না। এ কি পাটনায় আরবীভাষায় কোরআন পড়বার দরুণ? মুসলমানগণ তাঁকে ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বলে বিশ্বাস করতেন। আমরাও আজ একশ' বৎসর তাঁকে বৈদান্তিক বলেই দাবী করে আসচি। খৃষ্টানগণও তাঁকে খৃষ্টান বলেই জানতেন, সাম্য-মৈত্রী-সাধীনতাপন্থী ইউরোপের বৈজ্ঞানিক কিম্বা নৈয়ায়িক তাঁকে তাঁদেরও বন্ধু বলতে পারেন। বাঙলার সাহিত্যে তিনি যে কেবলমাত্র মূল সুরটি ধরিয়ে দিয়েছেন, তা-ই নয়, অলীক কাল্পনিকতা হতে প্রত্যক্ষ জগতের সুখদুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সাধনার পথ দেখিয়ে দিয়েচেন। গদ্যরচনার প্রবর্ত্তকও

রামমোহন; বাঙলা সাহিত্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, আর্য্যসভ্যতার, সম্পদ, খৃষ্টজীবনের মূলমন্ত্র এবং য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকপ্রথা তিনিই এনেছেন, ভারতবর্ষের সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিশারদ তাঁকেই প্রথম পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেন। এমন কি আচার্য্য বসু মহাশয়ও বিজ্ঞানের যে নূতন পথ আবিষ্কার করেছেন সেখানেও আমরা রামমোহনের "ভাব সেই একে"-কে দেখতে পাই।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁর সখ্যতা আকিঞ্চন করতেন, ভারতশাসনসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁর সাক্ষ্য চেয়েছিলেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যে উদারনীতি ঘোষিত হয়েছিল সেখানেও আমরা রামমোহনের প্রতিভা দেখতে পাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে তাঁদের মিত্র বলেই জানতেন, সেইজন্য চতুর্থ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক কালে তিনি আসন পেয়েছিলেন বিদেশী প্রতিনিধিগণের মধ্যে।

কেন না বিশ্ব-সভ্যতা তাঁর মনে একটি অখণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেছিল। যে বীজটি প্রাণবান তা যেমন বহুদিন ভূগর্ভে থেকে নিজের মধ্যে শক্তি আত্মসাৎ করে বেড়ে ওঠে, রামমোহনের অন্তর্জ্জীবনও সেই রকম বহু বৎসর নির্জ্জন থেকে নানা শাস্ত্র হতে সত্য জ্ঞান এবং আনন্দ অর্জ্জন করেছিল। তিনি লোকাচারের একাধিপত্য দেখেও হতাশ হন নি, বরং অধিকতর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংস্কৃত, ইংরাজি, হিব্রু, গ্রীক শিখে-ছিলেন। এক এক দেশের ভাষার ভিতর দিয়ে তিনি সেই সেই দেশের সভ্যতাকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করেছিলেন। সকল দেশের সাহিত্য, সভ্যতা তাঁর কাছে বিশ্বাত্মার বহিরাবরণরূপেই এসেছিল। যতই নানা শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের অন্তরে প্রবেশ করতে লাগলেন, ততই একই বিশ্বা-ত্মায় বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হতে লাগল। একই অমৃত ধারাকে মানুষ নানা

দেশে, নানা কালে বিভিন্ন নাম দিয়ে গান করেচে এবং এখনও করচে। একই শুভ্র সূর্য্যকিরণ দেশে দেশে নানা রংএর মনের ভিতর দিয়ে আসাতে নানা রূপে মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েচে—পাশব জীবনের অধীনতা হতে সাত্ত্বিক জীবনের আনন্দে যাবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেচে, গতি দিয়েচে, বল দিয়েচে, অনুপ্রেরণা দিয়েচে। ঊনবিংশ শতাব্দীর Comparative Theology-র আরম্ভ আমরা সেইজন্য রামমোহনেই প্রথম দেখতে পাই। তবে বৈজ্ঞানিকগণ জগতের নানা ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করেন শুষ্ক জ্ঞানের জন্য, খৃষ্টান পাদরীগণ পাঠ করেন তাঁদের হাতে নতুন ছাঁচে-ঢালা খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্য; কিন্তু রামমোহনের আস্তিক মন দেখেছিল সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র একই জগৎ পিতার মহিমা ঘোষণা করচে। এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল বলেই তিনি আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করতেন আমাদের শাস্ত্র হাতে নিয়ে, শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক করতেন বাইবেল হাতে নিয়ে।

(৯)

সুধী এমার্‌সন বলেছেন, "যুগের মূল উৎস এক আধ্যাত্মিক সত্তায়, পরিমিত কাল অনন্তের প্রচ্ছন্ন বেশ ধারণ করেই ব্যবহারক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, ইহা অনন্তেরই মহৎ এবং ঐশ্বর্য্যশালী প্রতিনিধি; অনন্ত যে সকল উপায়ের দ্বারা তাঁর কর্ত্তৃত্ব-শক্তি জগতে প্রয়োগ করেন, নানা যুগ তার নিদর্শনমাত্র; ইহা এমন এক আধার, যাতে অতীত তার ইতিহাস রেখে যায়, এমন এক উপকরণ যার মধ্য হতে বর্ত্তমান যুগের প্রতিভাশালী মণীষীগণ

ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলেন। অসংখ্য জাতি এবং তাদের বিভিন্ন আচার ব্যবহার, লোক-হিতকর অনুষ্ঠন এমন কি দলবদ্ধ মতামত, এই সকল নিয়েই যে বর্ত্তমান যুগ এক দিব্য ইতিহাসের পবিত্র অধ্যায়ের ন্যায়, এক অপূর্ব্ব সৃষ্টির পূর্ব্বাভাসের ন্যায়, পাঠ করতে হবে; বিশ্বাত্মা স্বয়ংই ইহার ব্যাখ্যা আমাদের চোখের সম্মুখে করচেন; এবং প্রতিদিনের বড় বড় ঘটনার মর্ম্মোদ্ঘাটন করবার জন্য আমাদের আহ্বান করচেন।" ইহা মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিত শক্তি নিয়েই জগৎ জগৎ, জড়স্তূপ নয়। অধৈর্য্য, অহঙ্কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার ধৃষ্টতা যুগের অন্তর্নিহিত বিশ্বাত্মাকে ব্যক্ত হতে বাধাই দিয়ে থাকে। রামমোহনে আমরা দেখতে পাই জগৎব্যাপী চিত্ত-চাঞ্চল্যের সহিত অবাধ সহানুভূতি এবং উদ্বেল ভাবসমুদ্রকে অন্তরের নির্জ্জনতার মধ্যে সহজেই ধারণ করে রাখবার অপরিসীম শক্তি এবং আনন্দ। এই জন্য আমরা তাঁতে বিদ্রোহীর চিত্তবিক্ষেপ দেখতে পাই নে। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে, তা আমাদের সমাজেরই হোক, বৌদ্ধ সমাজেরই হোক, কোম্পানী বাহাদুরেরই হোক, তিনি দাঁড়াতেন, তাঁর বলিষ্ঠ—উন্নত দেহ জ্ঞানোজ্জ্বল মন এবং ভক্তিতে নত আত্মা নিয়ে।

ভারতবর্ষের সমস্যা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্যা। নানা ধর্ম্মের (সাম্প্রদায়িক) উর্দ্ধে এক ধর্ম্ম এবং নানা প্রাদেশিকতার উপরে এক রাজশক্তির আবশ্যকতা এই দুইটি বিশ্বাস এবং উদার হৃদয় নিয়ে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর জাতিবিচার ভৌগলিকসংস্থানের বাধা স্বীকার করত না। Spain-এ Constitutional government স্থাপিত হয়েচে শুনে তিনি

Town Hall-এ এক public dinner দিয়েছিলেন; আবার যে দিন সংবাদ এসেছিল যে Russia, Prussia, Austria, Sardinia এবং Naples-এর রাজন্যবৃন্দের সম্মিলিত চেষ্টায় Naples আবার Austrian সৈনিকদের বেয়নেটের তাড়নায় পরাধীন হয়েচে, তখনও তিনি এই সংবাদে এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে বাকিংহাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করবার কথা থাকলেও, দেখা করতে যেতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, "I consider the cause of the Neopalitans as my own." পৃথিবীর একপ্রান্তে কোথায় কলিকাতা আর-একপ্রান্তে কোথায় Naples !!!

মিস্ কলেট সেইজন্যই বলেছেন, "If we follow the right line of his development we shall find that he leads the way from the orientalism of the past, not to, but through Western Culture, towards a civilisation which is neither Western nor Eastern, but something vastly larger and nobler than both."..."The power that connected and restrained, as well as widened and impelled, was religion."

এই যুগধর্ম্মকে যিনি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার সংকল্প কখনই পোষণ করত পারেন না। যুগধর্ম্ম জগৎ থেকে, মানুষ থেকে একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এর পতাকাধারী বীরাত্মাগণ বিশ্ববিধানকে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখিয়ে দেন; কেন না তাঁরাই বিশ্বাত্মাকে স্বীকার করে, প্রমাণ করে অগ্রসর হয়ে থাকেন। যে অভিমান জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হবার কুমন্ত্রণা আমাদের দেয়, তা যুগধর্ম্মকে ব্যক্ত হতে বাধা দেয়, তা অধর্ম্ম।

(১০)

আমরা এখন আমাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মসমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে যুগধর্ম্মের ভগ্নাংশকেই দেখতে পাচ্চি। তথাপি যুগধর্ম্মেরই ভগ্নাংশ, লোকাচারের বশীভূত হয়ে গতানুগতিকের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নহে। এইজন্যই এরা একটা আশা আমাদের মনে আনে। "যে সময়ে জোয়ার আসে, সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের তরঙ্গ অপেক্ষা একটি তরঙ্গ তীর প্লাবিত করে অধিক অগ্রসর হয়েচে, আবার পশ্চাতে ফিরে যাচ্চে; অনেকক্ষণ আর কোনও তরঙ্গই আসতে দেখা যায় না; কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখা যায় সমস্ত সমুদ্রই সেখানে এসে পড়ে এবং সেই স্থানও ভাসিয়ে নিয়ে যায়"।

রামমোহনের মৃত্যুর পর যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব আমাদের দেশে হয়েচে তাঁরা যথার্থই ভক্ত ছিলেন; তাঁদের হৃদয়মন জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত, তাঁরই আদেশে পরিচালিত হয়েছিল বলে আধ্যাত্মিক সাধনায় জনসাধারণের ঊর্দ্ধে তাঁরা আরোহণ করেছিলেন; অনেক সময়ে এত দূরে তাঁরা গিয়ে পড়েছিলেন যে, অনুচরগণ আর তাঁদের নাগাল পায় নি। তাঁদের সাধনা যে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে, যুগধর্ম্মের ভগ্নাংশ হলেও তাই পূর্ব্ব হতে তাঁরা ঘোষণা করেছেন।

রামমোহনের আত্মত্যাগ আমাদের দেশে বিফল হয় নি। মাতৃ-স্তন্যের সহিত মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে "ভাব সেই একে"র জ্বলন্ত ভাবটি শিশু গ্রহণ করচে; যা বিশ্ব-সভ্যতার মেরুদণ্ড, যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে ঐ ভাবটি সাধন করচে। এই যুগ নির্জ্জনে ভাবরসসম্ভোগের কিম্বা

উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির গতিবেগে লক্ষ্যহীন হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার যুগ নয়। এই যুগে মানুষ কর্ম্মের দ্বারা আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি করবার জন্য বহু শতাব্দীর নিশ্চেষ্টতা হতে জেগেচে। কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রয়েচে কেবলমাত্র জন্মভূমি পল্লিগ্রামে নয়, বৃহৎ ভারতবর্ষে এবং তাহাপেক্ষাও বৃহত্তর য়্যুরোপে, য়্যামেরিকায়। আমাদের সাহিত্যে শিল্পে, রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে এই যুগধর্ম্মকেই প্রকাশ করতে হবে। কোন পলিটিক্যাল উদ্দেশসিদ্ধির জন্য আজ মুসলমানের, কাল য়্যামেরিকার, তার পরের দিন ইংলণ্ডের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ীও হবে না, তাতে আমাদের সম্মানও থাকবে না। দুর্ব্বল যাকে বল বলেই ভ্রম করে, রামমোহনে আমরা ঐরূপ চতুরতা কখনো দেখতে পাই নে। সকল প্রকার ভাবরস-সম্ভোগে উন্মত্ততাকে জয় করে সহিষ্ণুতা এবং আত্মপ্রকাশে সংযম অনুশীলন করতে হবে; তাতেই ইচ্ছাশক্তি তীব্র হবে।

আমরা সকলে স্বাধীনতা পাবার জন্য অধীর হয়েচি; কিন্তু আমরা আমাদের "স্ব"-কে কি পেয়েচি যে, একমাত্র তারই অধীনতা স্বীকার করব, আর কাহারও নহে? রামমোহনের সময় ইংরাজই ভারতে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, আর এখন ইংরাজের ক্ষাত্রশক্তি পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করচে। যুগধর্ম্মসাধনার সময় অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নয়। এই সময়ে রামমোহনকেই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। তাঁর অন্তর সত্য-স্বরূপের সহিত যোগযুক্ত ছিল বলে তাঁর চিন্তায় এবং কাজে বিশৃঙ্খলা ছিল না; তিনি তাঁর ইচ্ছাকে গণতন্ত্রের ইচ্ছার সহিত সেইজন্যই সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বহিতের লক্ষ্য পরিচালনা করতে পারতেন, কাউকে খর্ব্ব করে, তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে

তাঁকে কখনো দেখা যায় নি; কখনো সে চেষ্টাও করেন নি। "আত্মীয় সভা" হতে "ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন পর্য্যন্ত তিনি দশজনের মধ্যে থেকেই করেচেন; অথচ নিজের প্রবৃত্তিকে কখনো উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতে দেন নি। গণতন্ত্রের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এইরূপেই তাঁর মধ্যে হয়েছিল। কেন না তিনি ছিলেন ত্যাগী। তিনি পরা এবং অপরা বিদ্যায় জ্ঞানবান অথচ ভক্তিতে নত; বিশ্ববিধাতার যন্ত্র ভিন্ন নিজেকে আর কিছুই জ্ঞান করতেন না; তর্কে অজেয় অথচ কর্ম্মে দক্ষ; তিনি ধর্ম্মসংস্কারক অথচ রাজনীতি বিশারদ; সমাজসংস্কারক অথচ প্রাচীন সমাজের শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি উপনিষদ্ বেদান্তের অনুবাদক অথচ খৃষ্টের উপদেশাবলীর সঙ্কলন-কর্ত্তা। তাঁর জীবন হোমানলের ন্যায় ঊর্দ্ধপানে নবযুগের নবীন আকাঙ্ক্ষা-সকলকে বিকীর্ণ করেছিল, সেই জ্যোতির্ম্ময় দিব্যাগ্নিতে নবযুগকে চিনে নেবার সময় এসেচে, এর ভগ্নাংশে আর আমাদের স্নানসঙ্কুলান হচ্চে না। তাঁর চরণে প্রণাম করে, তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিশ্ব-সভ্যতার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার অনুকূল মুহূর্ত্ত এসেচে। আরম্ভ যেখানে হয়েছিল, এর শেষও হবে সেইখানে—বিশ্বহিতে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রেমের সমাধি

মথুরার রাজপুরে বৃথা ঘুরে কবি—
প্রণয় দেবতা—তার দরশন লাগি' ;
নীতিচক্র ধ'রে হেথা যে রয়েছে জাগি'—
নয়নে ভ্রুকুটী তার, নাহি প্রেমছবি।
বৃন্দাবনী প্রেম-গাথা সে ভুলেছে সবি—
কে কবে ফিরিয়াছিল গরব তেয়াগি'
কুঞ্জপথে রাধিকার প্রেমভিক্ষা মাগি'—
হেথা আজি অস্তমিত প্রণয়ের রবি।

রাজ্যনীতি সাথে প্রেম—সে কি রহে কভু !
দেবতা গোকুলে ছিল, মথুরাতে প্রভু।

মধু রাতে হেথা নাহি আবীরের খেলা,
কুঞ্জে নাহি শোনা যায় বাঁশরী নিঃস্বন ;
যমুনার কূলে নাহি গোপিকার মেলা—
কবিহৃদে নাহি জাগে প্রণয় স্বপন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

মুখ চেনা

রাস্তায় কতরকমের মুখই চোখে পড়ে।

চোখে পড়ে অনেক মুখ ; কিন্তু মনে গেঁথে থাকে দু-চারটি। সমঝদার পাঠকদের কারও মনে মনে হাসবার দরকার নেই। আমি মনের উপর কোনও সুন্দরীর মুখের ছাপের কথা বলছি নে। আমি বলছি পরুষ পুরুষজাতির মুখের কথা।

একদিন একটা খেয়াল চাপল, লোকের মুখ দেখে ঠিক করব তাদের প্রকৃতিটা কি রকম। বড় বড় কবিদের গ্রন্থ পড়ে' ঠিক করে নিলুম ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মুখের আকৃতিটা সাধারণত কি রকম হয়ে থাকে। সরল, ক্রুর, শান্ত, দুর্দান্ত প্রভৃতি নানারূপ লোকের মুখের গড়নের ও চোখের ভাবের একটা তালিকা ঠিক করে নিয়ে একদিন রাস্তায় বেরলুম, মুখের ভিতর দিয়ে লোকের মন পড়ে' ফেল্‌বার জন্য।

বেরিয়ে ত পড়লুম। কিন্তু একি বিপদ ! সকলেরই মুখের ভাব যে প্রায় একরকম ! আজকাল মানুষগুলোর মন কি সব একছাঁচে ঢালা হচ্চে ?—আমি ভেবেছিলুম দেখ্‌ব কারও চক্ষু রক্তবর্ণ, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ ; কারও বা প্রশস্ত প্রশান্ত ললাটের নীচে চোখ দুটো দিয়ে একটা জ্যোতি বেরচ্ছে ; কেউ বা সন্দিগ্ধভাবে এদিক ওদিক চাইছে, ইত্যাদি। তা না হয়ে একেবারে—

যাইহোক্, যখন তা হল না তখন যেরকম মুখ চোখের সামনে পড়তে লাগ্‌ল তাই লক্ষ্য করে দেখতে লাগলুম।

(২)

একদিন একখানা ট্রামে উঠে দেখি একটি যুবকও সেই ট্রামে চলেছে। আমি অভ্যাসমত সব ক'জন আরোহীর মুখের দিকে চুপি চুপি একবার চেয়ে নিয়ে সেই যুবকটির মুখের দিকেও চেয়ে নিলুম—মুখখানিতে সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু পেলুম না, কিন্তু তবু কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম। আমার চোখ দুটো যেন তার মুখ থেকে আর ফিরতে চায় না। শ্যামবর্ণ মুখশ্রীর মধ্যে সৌন্দর্য্য পেলুম কেবল তার ঘন ঢেউ-খেলানো চুলগুলিতে। আমরা এতগুলো লোক ট্রামে, কিন্তু সে যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ট্রামের ছাদটার দিকেও চেয়ে ছিল না, অথচ তার চোখ দুটো ছিল সেই দিকে।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা, এই যুবক এত একমনে কি ভাবছে? সে হয় ত শেয়ালদা ষ্টেশনে কোনও আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরছে। ষ্টেশনে সে হয় ত এমন একটি সুন্দর মুখ দেখেছে, যার প্রভাব কাটানো বেচারা কোমলহৃদয় তরুণের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে! সে হয় ত মনে মনে তর্ক করছে "আনন্দ কার অধিক? সুন্দর মুখ যারা দেখে তাদের, না সুন্দর মুখের অধিকারীর কিম্বা অধিকারিনীর?" আমরা বাল্যে কতই মধুর স্বপ্ন দেখেছি। কত না রাজকন্যাকে বিবাহ করে অর্দ্ধেক রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছি! ঠাকুর্‌মার গল্পের কত না তরুণীর সুরভি মালা আমাদের সকলেরই গলায় ঝুলেছে? যুবকটি হয়ত তার শৈশবের কোনও স্বপ্নের

সঙ্গে আজকের দেখা মুখখানি মিলিয়ে দেখ্‌ছে।—কিছুক্ষণ পরে পাশে চেয়ে দেখি কখন্ সে নেমে গেছে। সেই সৌম্য ভাববিহ্বল মুখখানি কিন্তু আজও আমার মনে আঁকা আছে।

(৩)

আর একজনের মুখ, যা আমায় অনেকদিন ধরে ভাবিয়েছিল, আমি উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর ধরে দেখেছিলুম। সে মুখ কোনও যুবকের নয়—সে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোকের। তিনি আমাদের পাড়ায় পাঁচ বৎসর বাস করেছিলেন। গৌরবর্ণ মুখশ্রীতে কপাল থেকে মাথার উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত কেশের নামগন্ধও ছিল না। আর ঘন গোঁফের নীচে সর্ব্বদাই একটু হাসির অবশেষ লেগে থাক্‌ত। প্রতিদিন সকালে ভদ্রলোকটি তাঁর দশ বৎসরের সুন্দরী কন্যার হাত ধরে বেড়াতে যেতেন। রাস্তার কোনও জিনিসই তাঁর চোখ এড়াত না। আর পাড়ার মাতব্বরদের সকলের সঙ্গেই দু'একটা কথা না কয়ে তিনি পথ চলতেন না।

প্রথম যেদিন তাঁকে দেখলুম, আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলুম এই মনে করে যে, এতদিনে আমি এমন একটি লোক দেখতে পেলুম, যিনি যেমন ভাবুক তেমন কর্ম্মঠ। সচরাচর যাঁরা ভাবসাগরে ভাসেন, তাঁরা পৃথিবীর আহারনিদ্রা, বেচাকেনা প্রভৃতি জঘন্য ব্যাপারগুলো কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। ইনি যে মনে মনে সমস্ত দিন বাজারের হিসাব করেন না, তা তাঁর প্রফুল্ল মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। অথচ তিনি যে বাজারের হিসাবকে ভয়ও করেন না, তা তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতেই প্রকাশ পেত।

আমি মনে মনে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনটা কল্পনা করে নিলুম। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর স্ত্রীকে এখনও শোনান্—প্রথম যেদিন তাঁর স্ত্রীর হাত তাঁর হাতের উপর রেখে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন তাঁর মনের ভাব কি রকম হয়েছিল! আর একদিনের হাস্যকর ঘটনা আজও সেই প্রৌঢ় দম্পতিকে নিশ্চয়ই খুব হাসায়। সেদিন নিস্তব্ধ দুফুরে তাঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতার' সেই স্থানটি পড়ছিলেন :—

"আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা,
অমৃতসরস তোমার পরশ, তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

এমন সময়ে স্বামীটি শুনতে পেলেন পাশের বাড়ীর হেমবাবু লেংড়া আম যে তখন টাকায় পঁচিশটা, তা না জেনে টাকায় বিশটা কিন্‌ছেন। অমনি সেই সাধ্বী স্ত্রী আর হতভাগিনী পতিতা উভয়কেই বিস্মৃত হয়ে তিনি ছুটলেন হেমবাবুর সাহায্যে!

(৪)

এতেই আমি বুঝতে পারলুম যে আমি মুখতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়াচ্ছি। একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁরা বহুপ্রাচীন পৃথিবী থেকে লুপ্ত কোনও প্রাণীর যদি এক টুক্‌রো হাড় পান ত বলে দিতে পারেন সে প্রাণীটার গড়ন কি রকম ছিল। আমিও তেমনি মানুষের মুখের একটা দাগ দেখলেই তাঁর মনোরাজ্যের একটা মানচিত্র এঁকে দিতে পারতুম।

কিন্তু সব ওলোটপালোট্ হয়ে গেল একদিন! সেদিন পাঁচ মিনিট ধরে একটু করে বৃষ্টি হচ্ছে আর একবার করে থামছে। আমি

বেরিয়েছি নতুন মুখের সন্ধানে। হঠাৎ এক ঝাঁক বৃষ্টির জল মাথার উপর এসে পড়্‌ল। দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়ীবারান্দার তলায় আশ্রয় নিলুম। সেখানে আরও দুটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেই এক আফিসের কেরানী বলে বোধ হল। একটি জীর্ণশীর্ণ, অপরটি স্থূলকায়। যিনি স্থূলকায় তাঁর দিকেই আমার নজরটা বিশেষভাবে পড়্‌ল। এ রকম অরসিকোচিত আকৃতি সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রথমেই তাঁর গোঁফের কথাটা বলি। গোঁফগুলি তাঁর, কামাবার বুরুষের মত, ওষ্ঠ থেকে সোজা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর তাঁর চিবুকটা একটু অস্বাভাবিকরকম সামনের দিকে ঠেলা। চোখ দুটি ক্ষুদ্রাকার, আর কপালের মধ্যে গভীরভাবেই বসানো। তাঁর সেই গম্ভীর মুখে হাসি-অপদেবতা যে কোনকালে উপদ্রব করেছিল বলে আমার বিশ্বাস হল না।

হঠাৎ ক্ষীণকায় ভদ্রলোকটি তাঁর সঙ্গীকে বল্‌লেন, "হোক্, কত বৃষ্টি হতে পারে দেখি, না-হয় রাত ৯টায় বাড়ী পৌঁছব। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "না মশায়, আমায় বাড়ী এখনি পৌঁছতে হবে; মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটো বাড়ীতে আছে, আমি না গেলে তারা বিকেলে জলই খাবে না।"

হরি হরি! একি হল? সব যে গোলমাল হয়ে গেল! আমি এতক্ষণ ধরে তাঁর মনের যে ছবিটা আঁকলুম, সব ভেস্তে গেল? এমন গোঁফ যার তার মনে যে মমতার লেশমাত্রও থাকতে পারে না সে বিষয়ে ত আমি নিঃসংশয় হয়েইছিলুম, পরন্তু পৃথিবীর কাউকেও যে সে বিশ্বাস করতে পারে না বা ভালবাসতে পারে না। তাও আমি ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু এ যে বলে সে বাড়ী

না গেলে তার ছেলে মেয়ে দুটি খাবে না? তার চেহারাটা আমার কাছে যতই ভয়াবহ হোক্, তার সেই গোঁফের নীচে তার ছেলে মেয়ে দুটি স্নেহকোমল মূর্ত্তি দেখতে পায়। যার অনুপস্থিতিতে তারা খেতে পর্য্যন্ত চায় না তাকে তারা কতই ভালবাসে!

লোকটি বিপত্নীক। তার স্ত্রীকে সে কখনও কবিতার বন্যায় ভাসিয়ে দেয় নি, কিন্তু নিশ্চয়ই অন্তরের অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী নির্ভয়ে তারই কোলের উপর মাথা রেখেছিলেন। সে মুখে বলে নি বটে, "প্রিয়ে! চাও, চাও, অনন্তের পারে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে"—কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল ছেলে মেয়ে দুটিকে মায়ের অভাব বুঝতে দেবে না।

সেই দিন থেকে মুখ দেখে মনের ভিতরটা পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীতারাদাস দত্ত

ত্যাগী

—:০:—

দীক্ষার সময় আচার্য্য ব'ললেন—"বৎস, নীতির উপরেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান; এইটী মনে রেখো।"

শিষ্যের মন উৎসাহে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।—তাকে তো নূতন ক'রে কিছু ত্যাগ করতে হবে না; সে তো জীবনে কখন নীতির পথ হতে চ্যুত হয় নাই; জ্ঞানত অজ্ঞানত কখন তার পদস্খলন হয় নাই; পাপকে দূরে রেখে অতীতের দিনগুলো একরূপ আড়ষ্ট ভাবেই কাটিয়ে এসেছে সে।.....

অতএব ধর্ম্ম তার করতলগত। এখন শুধু ইষ্টলাভ হ'লেই সে সফলকাম হয়।

তারই জন্য আয়োজন সুরু হল।

* * * *

বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল।

অস্থিচর্ম্মসার দেহ আর অন্ধতমসাবৃত মন—এই নিয়েই সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ ক'রে ব'সে থাকে; কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কিছু তো তার মনের আকাশে প্রতিফলিত হ'ল না।

মন তার উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে।

বিশ্বকে সে পরিত্যাগ ক'রেছে কিন্তু মনে হয় বিশ্বের দ্বারা সে তো

পরিত্যক্ত হয় নাই। পাপের বন্ধনে হ'তে মুক্ত সে—তবু আজিও এ কিসের বন্ধন তাকে ঘিরে র'য়েছে?

সাধক হতাশ হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু সৃষ্টিকে যে বিস্মৃতির অন্ধকূপে প্রেরণ ক'রতে চায়, তাকে হতাশ হ'লে চ'লবে কেন?

সে তাই আবার আসন ক'রে বসে।.....

প্রকৃতি দেবীর মমতাদৃষ্টি সেই চর্ম্মাবৃত কঙ্কালের উপর প'ড়ে বিশ্বে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগিয়ে তোলে; স্রষ্টাপুরুষ উদাস নয়নে চেয়ে থাকেন।

* * * *

এমনি ক'রে কত বৎসর কেটে যাবার পর—

লুপ্ত স্মৃতি ও শিথিল ইন্দ্রিয়গ্রাম—এই সম্বল নিয়ে সাধক একদিন জেগে উঠ্‌ল; ব'ললে—"এই তো উপলব্ধি"।

গুহার মধ্যে উপহাস প্রতিধ্বনি হ'ল—"এই তোর উপলব্ধি!"

* * * *

সাধু বাইরে চেয়ে দেখলে—

প্রকৃতি তার শ্যামল হাতখানি তারই জন্যে প্রসারিত ক'রে রেখেছে; বিহগকণ্ঠ তার মঙ্গলাচরণ ক'রছে; ফল, ফুল আর নির্ঝরের জল তারই অভিষেক-মন্ত্র পাঠ ক'রছে।

সাধু ভাবলে—"এতো আমারই প্রাপ্য, কেননা আমি প্রকৃতিজয়ী।"

আরও একটু এগিয়ে দেখ্‌লে—

নগরোপান্তে কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

সাধুকে ব'ললে—"তপোধন আমি যে কতযুগ ধ'রে তোমারই অপেক্ষায় র'য়েছি। তপোক্লিষ্ট দেহে সেবা গ্রহণ ক'রে আমায় পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত কর।"

আত্মপ্রসাদগর্ব্বিত সাধু মনে ভাবলে—"সেবা তো আমারই প্রাপ্য—নারীরূপা প্রকৃতির প্রভু তো আমিই।"

(২)

প্রসন্ন শান্তিতে কয়টা দিন কেটে গেল।

রমণীর স্নেহ যত্ন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সাধুর মনে কোথায় এবং কখন যে বিকার আরম্ভ হ'ল—তা' সে নিজেই বুঝতে পারলে না।.....

বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত বাসনা একত্রিত ক'রে সাধু একদিন জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি, নারী?"

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নারী উত্তর ক'রলে—"তোমারই মনের মধ্যে।"

—কে তুমি?

—তোমারি বাঞ্ছিতা আমি নৈতিকতার অধিষ্টাত্রী দেবী।

—তুমি আমারই সাধনলব্ধা?.....এতদিন কেন জানতে দাও নি, নিষ্ঠুর?

—সত্যই আমি নিষ্ঠুর। বিশ্বের মাঝে তোমার ইষ্ট যেথা বিরাজ ক'রতেন, সেই জায়গাটা আড়াল ক'রে এতদিন দাঁড়িয়েছিলুম আমি।

—আর আজ ?

—আজ সময় হ'য়েছে তাই ধরা দিতে এসেছি।

* * * *

রাত্রি শেষে সাধু বুকের উপর থেকে রমণীকে দূরে ফেলে দিলে।.....

কি কুৎসিৎ, কি বীভৎস মূর্ত্তি তার!

এ-কেই সে এতদিন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা ক'রে এসেছে!... ..

রমণীর কুটীল হাস্য অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল—একটা বিদ্যুত-ঝলকের মত।

সাধু সেই আলোকে দেখলে—

বিশ্বের সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত পাপ তারই হৃদয়দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তারই শরণপ্রার্থী হয়ে।

তাদের ফিরিয়ে দিলে তো তার নিজের মুক্তি নাই।

সেই দিন সাধু প্রথম বিশ্বের সঙ্গে তার একাত্মতা- অনুভব ক'রলে।.....

রমণীর বিদ্রূপহাস্যে ক্ষুদ্র কুটীর আবার মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল।...যন্ত্র-

চালিতের মত সাধুর হস্ত রমণীর কণ্ঠদেশ স্পর্শ করলে.....পরক্ষণে রমণীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে প'ড়ল।

* * * *

শিষ্য এসে আচার্য্যের পায়ে মাথা রেখে আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—"প্রভু, এতদিনের সাধনা আজ বিফল হ'ল ?"

আচার্য্য ব'ললেন, "বৎস, এতদিনের পর আজ তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়াল।"

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পুরোনো কথা

—:❀:—

আমার লিখিত গত কংগ্রেসের রিপোর্ট দৃষ্টে কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, আমি স্কুল-কলেজ ও আইন-আদালত বয়কট করবার রাজনৈতিক সার্থকতা এবং আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য যথোচিত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী আইনই যে দেশের সকল অনর্থের মূল এ মত নূতন নয়। ইংরাজ extremist এ কথা বহুকাল থেকে বলে এসেছেন।

উক্ত মত সম্বন্ধে আমার মতও নতুন নয়। প্রমাণস্বরূপ আজ থেকে সতেরো বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারের মহামান্য গুলিখোর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুরকে ইংরাজি ভাষায় যে পত্র লিখি, সেখানি আদ্যোপান্ত পুনঃ প্রকাশ করছি। বঙ্গ ভঙ্গের কারণ দর্শিয়ে বড়লাটের তরফ থেকে মান্যবর রিজলি সাহেব যে রিজলিউসন প্রকাশ করেছিলেন, সেই রিজলিউসন সমর্থন করেই উক্ত নিবেদন পত্র লেখা হয়।

শিক্ষিত ভারতবাসী ও উকিল সম্প্রদায় সম্বন্ধে মান্যবর রিজলি সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য ছিল, নিম্নস্থ পত্রে পাঠক তার পরিচয় পাইবেন।

আমার বিশ্বাস স্কুল কলেজ এবং আইন-আদালত বন্ধ করে দেবার স্বপক্ষে সকল সদযুক্তিই এ পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বীরবল

A SUPPRESSED MEMORIAL.

Reprinted from "The Englishman."

The Official Secrets Act has not yet been amended so as to make the publication of suppressed memorials criminal. We accordingly give publicity to the following copy of a petition which has, we understand, been presented to the Viceroy:—

The Humble Petition of the Honourable Society of Opium-smokers, Bagbazar.

"Sheweth"—That the proposal of partitioning Bengal and transferring its eastern districts to Assam, has met with the whole-hearted approval of your petitioners, who by common report, are the most contemplative, peace-loving, loyal and timid community of his Majesty's subjects, in as much as such territorial redistribution satisfies their sense of the natural fitness of things, a sense the possession of which is considered by them as one of their proud privileges.

"That the hue and cry raised by the non-opium-smoking section of the Bengalee community, besides being annoying, vulgar and noisy to a degree, is factitious, possibly fictitious, at any rate inconsistent with the traditional somnolent suavity and dignified apathy of the race, and as such cannot but be condemned by those, who like your petitioners seek to preserve the continuity of traditions through the medium of a vegetable product which contains the very soul of conservatism.

"That your petitioners have perused with pleasure, the letter written by the Hon'ble Mr. Risley, and in their humble

opinion, it is a masterpiece of a type of literature that is yet to come. What they specially admire in that letter, as a literary production, is its absolute freedom from the vicious rules of reason and logic, consistency and relevancy, which hamper the free flow of original ideas, and in only too many cases repress the native genius of the writer. Your Lordship is well aware that fools only make a fetish of reason, and as fools happen to be in the majority, she has become an idol of the marketplace. But as your petitioners avoid the busy haunts of men and the light of day, passing their lives in silent and secluded temples of contemplation, vulgarly known as opium dens, they have succeeded in preserving the freedom of their spirit, and can legitimately claim to be intellectually the best fitted community to appreciate the imaginative and emotional qualities of Mr. Risley's letter.

"That your petitioners fail to comprehend on what valid grounds the agitating and agitated Bengali public can take lawful exception to the proposed partition. It has been established beyond cavil, by scientific reasoning and scientific appliances, that no people or race in Asia, can claim their country to be an impartible estate. Ignorance of the above argues a deplorable lack of the perception of the eternal verities of the modern world, with which it is not possible to have any sympathy. Why?—It has only recently been decided by the Committee of Nations that even the Celestial Empire is eminently and imminently partible. In view of the above fact, it is ridiculous for the Babus of Bengal to pretend that the integrity of their country must be kept intact. An imperial statesman, like your Excellency, cannot possibly countenance such outrageous pretensions on the part of a law-abiding people.

"That your petitioners beg leave to submit that the Hon'ble Mr. Risley in his anthropological investigations, never hit upon a profounder truth than when he discovered that the spread of education is the cause of the increase of litigation. Your petitioners were under a fond delusion, that such concealed truths, could only stand revealed to the votaries of the divine drug. But now they have to admit in all humility that inspiration is even more potent than inhalation. That English education creates a penchant for British justice is a proposition which few will care to controvert. To put it in the language of Hindu philosophy one is the counterpart of the other, and without their union, which is brought about by an agency called the Press, the above evils can neither be propagated nor multiply. Your Lordship must be aware that your petitioners hate education and dread law. Education begets a dynamic state of mind, whereas the ideal of all true lovers of opium is the blissful state of static calm. And it has been the painful experience of your petitioners, that an opium-smoker enters a Court of law, only to be transferred therefrom to a cognate institution, where no opium can be procured and from which no member of their community ever returns. For the above reasons, your Excellency's Government has laid your petitioners under a deep debt of gratitude, by devising a scheme whereby the evils of education and litigation would effectively be brought under the control of personal rule.

"That your petitioners love both Assam and its people with a love that passeth all understanding. It is universally known, that when the fumes of opium mount to the brain, man's thoughts wander 'Kamrup' way, and his imagination clings fondly to that magic land of golden-hued damsels. And that

it is not for your Lordship to neglect lands of mist and mysticism, is amply evidenced by the fact of your having sent an eseteric mission to Lhassa, the advent of which, as your petitioners have been credibly informed by an authentic telepathic message, has sent such a thrill of joy through every fibre of the soul of the Dalai Lama, that he could not help instantly falling into an ecstatic trance which, it is expected, will gradually fade off into total Nirvana. So your petitioners hope and believe that your Excellency will treat with deserved contempt the soul-less criticism of those grossly materialistic men who would foolishly forego this unique opportunity of being bodily transferred to that romantic land of Assam, where it is always afternoon.

That your petitioners cannot deny that there is a time-honoured tradition in this country believed in by all sensible men, not spoiled by education, that Bengalis when they go to Kamrup are turned into sheep, but that, in the opinion of your petitioners, cannot be a sufficient reason for opposing the Government proposal, because it has not been proved that such transformation would mean a loss of zoological status to the Bengali race.

"That your Lordship well knows that the people of Assam belong to that family of human being, known to scientists as the Mongoloid. The Mongol has in him a deep-rooted craving for opium and Buddhism, the two noblest products of the soil of Behar. Now, the Mongoloids can hardly be so false to their origin as not to be too keenly sensible to the seductive charms of the precious drug, and for that reason are considered by your petitioners as brothers. One touch of narcotic makes the whole world kin—and moreover opium is thicker

than blood. It, therefore, makes their hearts palpitate with joy to find, that the time is fast approaching, when the days of separation will be over, and brother with brother will be locked in a long and languorous embrace.

"That the sudden awakening of the geographical conciousness in the Hon'ble Mr. Risley, comes at a most opportune moment. That the ethnological significance of the Brahmaputra should have been discovered on the eve of the discovery of the secret sources of that sacred river by Colonel Younghusband, is a coincidence of such deep import, that it is bound to give food for thought to the most unthinking individual. And your petitioners submit that, now that the scientific boundary of Assam has been found, so woefully missed by all previous rulers, your Excellency should not allow it to be confused by the ignorant clamour of a prejudiced public. A people like a country should be kept within its proper bounds, for it is certain, that progress of a people beyond its natural limits is alchoholic in its tendencies, and as such is utterly repugnant to your petitioners, who detest all things stimulating as pernicious antidotes.

"That your petitioners have no desire to further trespass on your Lordship's time, and tire your Lordship's patience by the enumeration of all the innumerable reasons that can be urged in support of the above beneficent scheme. But in conclusion, they make bold to offer a humble suggestion for your Lordship's kind consideration. If the burden of Bengal be too heavy for a provincial Governor, how immeasurably heavier, must the burden of India be for one Governor-General! So your petitioners beg respectfully to suggest, that in future the work of governing India should be divided among three

Viceroys. A diplomatic Governor-General for the Himalayas whose duty would be to watch and regulate the foreign relations of this country, to create complications and to procreate problems, and whose field of activity would range from Bhootan to Khotan on one side and from the Pamirs to the Amu on the other. Secondly, an artistic and literary Viceroy, for the plains, whose duty would be to preserve ancient monuments and build new ones, and administer the country by means of peripatetic orations, occidental in inward worth and oriental in outward beauty. Lastly a commercial Viceroy for the seas, whose duty would be to constantly flit to and fro between Rangoon and Bunder Abbas, looking after the ports, and controlling exports in the light of the new fiscal policy. According to the Hindu Shastras, even the Supreme Ruler of the universe found it necessary to divide his personality into three.—Shiva enthroned on the Himalayas, Vishnu in his incarnations, desporting over the length and breadth of India and Brahma, on his lotus, floating eternally on the limitless ocean.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উকিলের কথা

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়,

আমি উকিল হয়েও আপনার 'সবুজপত্র'-এর গ্রাহক ও পাঠক। এতেই বুঝতে পারছেন ওকালতিতে এখনও তেমন কিছু করে' উঠতে পারি নি। মোকদ্দমার ব্রিফ আর খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফ্ ছাড়া আর সব লেখা এখনও অপাঠ্য হয়ে ওঠে নি। আবার ও-ব্যবসাতে এমন ফেলও মারি নি যাতে বেদান্ত না পড়েও জগৎ সংসার মায়া মনে হয়, কি শ্বেত কি সবুজ, চোখে সবই ঘোরকৃষ্ণ মালুম দেয়। অর্থাৎ—আমি জুনিয়র উকিল। কাজেই ওকালতি ব্যবসাটির উপর মনে অনেকখানি মায়া ও কতকটা মোহ রয়েছে। কিন্তু এমনি দুরদৃষ্ট যে অনেক সাধ্য সাধনার পর ব্যবসার যেই একটু সুসার হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে অমনি চারদিক থেকে দেশের পণ্ডিত, মুর্খ, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান সবাই ও-ব্যবসাটির উপর একেবারে খাঁড়া উচিঁয়েছে। সে খাঁড়া কথার এবং লেখার হলেও তার ধার কিছু কম নয়। কার্ত্তিক মাসের 'সবুজপত্র'-এ 'বাঙালীর কথা' উপলক্ষ্য করে' 'ওকালতি বুদ্ধি'র উপর একহাত নিতে আপনিও ছাড়েন নি। চারদিক থেকে খোঁচা খেয়ে আত্ম-

রক্ষার খাতিরেই আপনাকে এই চিঠি লেখার চপলতায় প্রণোদিত হয়েছি। নইলে বিনা টাকায় মুসাবিদা করা আমাদের স্বভাব নয়।

উকিল সম্প্রদায়টির উপর দেশের রাগের কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত তারাই দেশের পলিটিক্যাল কাজে নেতাগিরি করে এসেছেন। কি প্রাক্‌স্বদেশী কংগ্রেসি ডেমন্‌ষ্ট্রেশন, কি পোষ্টস্বদেশী স্বরাজি আজিটেশন—সর্ব্বত্রই তারা হয়েছেন কর্ম্মকর্ত্তা। এবং আপনার মত যাঁরা মহাত্মা গান্ধির প্রচারিত নন্‌-ভায়লেণ্ট নন্‌-কো-অপারেশনের প্রসাদে বৎসরমধ্যে স্বরাজ লাভের আশ্বাসে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরাও এই বলে খুশী হয়েছেন যে, আর কিছু না হোক, ও-আন্দোলনে দেশী বিলাতী উকিল-নেতাদের নেতাগিরির খতম হবে। মক্কেলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশের কাজের চেষ্টা বা ভাণ আর চলবে না। কথা ঠিক। যে আন্দোলনের ফলে বছর না ঘুরতে বৃটিশকর্ত্তৃত্বের বাঁধন কাটিয়ে ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ করবে, যে বৃটিশজাত লাখ লোক দিয়ে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে আজ একশ' বছর ধরে শাসনে রেখেছে, গেল শ'কয়েক বছর ধরে' নিজের জাতভাই আইরীশম্যানের টুঁটি চাপছে, গেল যুদ্ধের সময় ইচ্ছামত পৃথিবীর সমস্ত জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কি অবাধ করেছে, এমন কি মহাত্মা গান্ধিকে দিয়েও অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণে সহায়তা করিয়ে নিয়েছে, সেই জাত সূঁচের খোঁচাটি না খেয়েও বছরের মধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে' ভারতবর্ষটা ভারতবাসীর হাতে তুলে দিয়ে 'বিট্রনপ্রস্থ' অবলম্বন করবে, এমন আন্দোলনের নেতার কেন, চেলার কাজও ওকালতির অবসরে করা একদণ্ডের জন্যও চলবে না; এবং বিলাতি মালের দালালির অবসরেও চলবে না। এমন কি স্বদেশী তাঁতে কাপড় বোনার ফাঁকে

কি স্বদেশী দোকানে মাল বিক্রির অবসরেও অচল হবে। কেননা ওর নেতা ও চেলা হতে পারে সে-ই যে, হয় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নয় যার ওর-থেকেই সংসার চলবে। কিন্তু উকিল-সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি। এমন প্রচেষ্টার কল্পনা দেশে পূর্ব্বে কবে হয়েছিল, এবং কোন্ উকিল তার নেতা হবার স্পর্দ্ধা করেছিল? আরও জিজ্ঞাসা করছি,—এতকাল যে সব প্রক্রিয়া করে' দেশ তার পলিটিক্যাল দুরবস্থা মোচন করতে চেয়েছে, উকিল তার উপযুক্ত পুরোহিত ছিল কি না? সভা ডেকে ইংরেজী বক্তৃতা করতে ও শুনতে হলে উকিলই হচ্ছে উপযুক্ত নেতা। কেননা যুদ্ধে বিক্রমের প্রয়োজন হলেও সভায় চাই বাক্‌পটুতা। এবং আমাদের অতিবড় শত্রুও কখনও বলে নি যে, আমাদের এ গুণটির কোনও অভাব আছে। ধরুন এ সব সভা-সমিতিতে উকিল নেতা না হয়ে নীরবকর্ম্মী নেতারা গিয়ে যদি নীরব হয়ে বসে থাকতেন তবে সেটা সঙ্গত না-শোভন হত। আসল কথা, যেমন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় কর্ম্মকর্ত্তাও তেমনি জোটে। আজ যদি দেশ সত্যিই মুখের কথা রেখে কাজের জন্য কোমর বাঁধে তবে তার গা ঝাড়ার সাড়া পেলেই উকিল-নেতারা দেশের কাঁধ থেকে আপনি নেমে পড়বেন। তাদের তাড়াবার জন্য নন্‌ভায়লেণ্ট নন্‌-কো-অপারেশনের পাশুপাত অস্ত্র দরকার হবে না। কেননা আপনি ওকালতি-বুদ্ধির যতই নিন্দা করুন, আত্মরক্ষার বুদ্ধিতে আমরা কারুর চাইতে খাটো নই। কিন্তু আমাদের নেতাগিরির উপর আপনাদের রাগের মাত্রা দেখে সন্দেহ হয় যে, বিশেষকিছু করবার মতলব আপনাদেরও নেই। কেন না কাজ যখন আরম্ভ হয়

তখন কাজের মুখেই তার নেতা গড়ে ওঠে, এবং যে তার চলার সঙ্গে তাল রাখতে না পারে সে আপনি ছিট্‌কে পড়ে। সে জন্য বেশি সোরগোল দরকার হয় না। দেশ তার কাজের নেতা বাছাই করে' নিতে পারে না, এ ডেমক্রেটিক যুগে তাই বা কেমন করে' মুখ ফুটে স্বীকার করি। তাই এ-ও বলে রাখছি, যদি দেখা যায় যে, নন্‌-কো-অপারেশন ব্যাপারেও আচারের বেশি প্রয়োজন হয় না, খুব কড়া প্রচারেই কাজ চলে যায় তবে উকিল-নেতাদের সরাতে পারবেন না। কেন না, নরম গরম দু' রকম বক্তৃতাই আমাদের সমান অভ্যাস আছে। এই দেখুন না, যে কৌঁসিলি হাইকোর্টে মুখ খোলে না, মফঃস্বলে ডেপুটীর কোর্টে তিনিই নরসিংহ অবতার।

কিন্তু আমাদের আসল মুস্কিল হয়েছে এই যে, নেতাগিরি ছাড়লুম বল্লেই লোকে আমাদের ছাড়ছে না। মহাত্মা গান্ধি আবিষ্কার করেছেন যে, যে-চার পায়ের উপর ভারতবর্ষের বৃটিশ-সিংহাসন খাড়া আছে আমরা হচ্ছি তার একটা পা। সুতরাং ঐ সিংহাসন নামাতে হলে আর তিন পায়ের সঙ্গে আমাদেরও সরে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ—উকিলেরা নেতাগিরি ছাড়ুক আর না-ছাড়ুক তাদের ওকালতি ছাড়তে হবে। বলা বাহুল্য, এতে আমাদের ঘোর আপত্তি। এবং সে আপত্তির কারণ সেই পুরোনো জিনিস, যার জন্য পৃথিবী জুড়ে' মারা-মারি, গালাগালি, হাঙ্গাম হরতাল চল্‌ছে, অর্থাৎ—পেটের ক্ষুধা। মহাত্মার কথায় অবশ্য অ্যানাটমির তর্ক তোলা বাচালতা, নইলে বলে' দেখা যেত, সিংহাসনের আমরা যে পা, ঐটি রেখে বাকি তিন্‌টে পা সরানো হোক। তাতে সিংহাসনের যে ভঙ্গী হবে উপবিষ্ট লোকটির পক্ষে তাই বেশি ভয়ানক। একেবারে চারটে পা সরালে সিংহাসন

নাম্‌বে বটে কিন্তু তাতে বসার কোনও অসুবিধা নাও ঘটতে পারে। চাই কি সেটা মাটীতে আরও বেশি গেড়ে বসবে। কিন্তু জানি এ সব মেডিকো-লিগাল যুক্তি একেবারে নিষ্ফল। কেন না বোধ হচ্ছে নন্‌-কো-অপারেশন-বিধিতে উকিল ও ডাক্তার দুই-ই বর্জ্জনীয়।

তবে যে নন্‌-কো-অপারেশনের জালে আমাদের ওকালতির জল থেকে দেশউদ্ধারের ডাঙ্গাতে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তার দু' একটা জায়গায় ফাঁক বড় বেশি। কেবল উকিলের চোখে নয়, একেবারে কানা না হলে সবার চোখেই তা ধরা পড়বে। নন্‌-কো-অপারেশনে স্বরাজলাভ হবে বছর মধ্যে, অথচ তার গতি ক্রমবর্দ্ধনশীল; পুরো বেগ প্রথম থেকে দেওয়া চলবে না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সিংহাসনের চার পা হল উপাধিধারী খোসামুদে, স্কুল কলেজের ছোক্‌রা, আদালতের উকিল, আর সেদিনকার নব সৃষ্টি—নখদন্তহীন কাউন্সিলের সভ্য। ভারতীয় সৈন্য নয়, ভারতবাসী পুলিশ নয়, সরকারের দেশী চাকর চাকুরে নয়! বাধ্য হয়ে স্বীকার করতেই হবে যে, এ নন্‌-কো-অপারেশনের তত্ত্ব আর সব তত্ত্বের মতই গুহায় নিহিত। সুতরাং শুন্‌তে যতই সহজ হোক, ওকে বুঝতে হলে ব্যাখ্যা দরকার। মহাত্মা গান্ধির একজন বাঙালী উকিল-শিষ্য এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বক্তৃতায় আমাদের বলেছেন, প্রথমেই যে উকিলদের ব্যবসা ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে বলা হয়েছে এটা তাদের পক্ষে বিশেষ সম্মানের কথা। কেননা এর অর্থ এ আন্দোলনের তারাই নেতা হবার উপযুক্ত। এর জন্য যে বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশপ্রীতি চাই তা তাদেরই আছে। অবিশ্যি যখন ইংরেজের ইস্কুল কলেজে না পড়লে এখন আর ইংরেজের আদালতে উকিল হওয়া যায় না, এবং ও স্কুল কলেজে ঢুকলেই

ভারতবাসীর মনোভাব হয় দাসের মনোভাব, তখন বিশেষ করে উকিল-সম্প্রদায়ের এ সব গুণ কোথা থেকে আসে এ সম্বন্ধে মনে সংশয় উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু সে কথা ভেবে দরকার নেই। নন্-কো-অপারেশন শাস্ত্রের কোনও ব্যাস কি জৈমিনী এই সব পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের একদিন নিশ্চয়ই মীমাংসা করবেন। আপাতত আমি উক্ত উকিল-শিষ্যের ব্যাখ্যা মেনে নেব। উকিল হয়ে উকিলের ব্যাখ্যায় তর্ক তুলে এম্পিরিট-ডি-কোর-এর অভাব দেখাব না।

ব্যাখ্যা যখন মেনে নিচ্ছি তখন তার টীকা টিপ্পনীতে দোষ নেই। এবং ও-ব্যাখ্যার উপর আমার প্রথম টিপ্পনী হল এই যে, ও-তে 'উকিল' কথাটা বসেছে মীমাংসকদের ভাষায় 'উপলক্ষণে'। ওর প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কেই ভারতবর্ষকে মুক্তির পথে পথ দেখিয়ে নিতে হবে। উকিলের নাম লক্ষণা করার অর্থ, ও-দলের মধ্যে তাদের মুখের ঠুঁলিটা একটু আলগা, গলার শিকলটা ওরি মধ্যে একটু ঢিলে। নইলে ইংরেজের আদালতে ওকালতি করার ফলে মাথার বুদ্ধি কি মনের সাহস কিছুই বেড়ে যায় না। ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের লোকেরই যে কেন নেতা হতে হবে তার কারণও অতি স্পষ্ট। যে-সম্প্রদায় ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে থেকে চিরকাল দেশের নেতৃত্ব করে আসছে, অর্থাৎ—বিদ্যা ও বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায় তারাই হয়েছে এ কালের ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়। এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের যে আদর্শ আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টার প্রবর্ত্তক সে আদর্শের অনেকখানি এসেছে আধুনিক ইউরোপ থেকে আর ইংরেজী ভাষার মারফতে; এবং মোটের উপর এর সঙ্গে পরিচয় এখনও ইংরেজি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

আদর্শটা ইউরোপ থেকে এসেছে বলে' লজ্জার কোনও কারণ নেই। সভ্যতার কোনো সৃষ্টি প্রায়ই দুবার করে' হয় না। এক জায়গায় হলে সব সভ্য জাত তাকে আত্মসাৎ করে। 'বিশ্বমানব' জিনিসটা যে কবির কল্পনা নয়, ধান কাপড়ের দরের মতই সত্য, এ-ও তার একটা প্রমাণ। আর ও-ভাব ও-আদর্শ ইউরোপেও কিছু আদিম নয়, সেখানেও ওটা সেদিনকার সৃষ্টি। নিতে জানলে নেওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই। এই দেখুন না, আমরা আজকাল সর্ব্বদাই বলছি ভারতবর্ষের কাছে সমস্ত পৃথিবীকে এখনও অনেক শিখতে হবে। 'পূব না হলে' পশ্চিমের চলবে না'—শ্রীযুক্ত বেনস্পুরের মুখে এ কথা শুনে ষোল হাজার লোক একসঙ্গে কংগ্রেসে হাততালি দিয়েছে। পরের কাছ থেকে নেওয়া যদি লজ্জার কথা হ'ত তাহলে পরকে কিছু দিয়ে তাদের লজ্জা দিতে মহাত্মা গান্ধির শিষ্যেরা নিশ্চয়ই লজ্জিত হতেন। আর ইংরেজী ভাষ' যে এখনও ও-ভাব ও-আদর্শের বাহন হয়ে রয়েছে তার কারণ শিক্ষার অবহুল প্রচার, যার ফলে ছাপার লেখা থেকে ভাব নেবার মত পড়া যেই পড়ে, সেই প্রায় ইংরেজী পড়ে। এ দশাটা যখন ঘুচবে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সাহিত্য বড় হয়ে গড়ে উঠবে তখন ও-সব ভাব ও আদর্শে পৌঁছিতে বিদেশী ভাষার পিঠে সোয়ার হতে হবে না। এবং মাতৃভাষার মারফৎ যখন তাদের সঙ্গে পরিচয় হবে তখন তাদের বিদেশী বলেও মনে হবে না। তবে ইংরেজের ইস্কুল কলেজে ইংরেজী পড়লেই আমাদের মনোভাব দাসের মনোভাব হয় বলে যে একটা কথা রটছে ওটা 'কামুফ্লাস' ছাড়া কিছু নয়, কেননা যারা ইংরাজিতে ও-বক্তৃতা করছে আর যারা শুনে ইংরেজী কায়দায় হাততালি দিচ্ছে ও-দু'দলই ইংরেজী ইস্কুলে ইংরেজী শিখেছে বলেই

ও কাজ করছে। নইলে সে ইস্কুলে যে পড়ে নি সে ও-কথার অর্থও বুঝতে পারবে না। আর এ-ও ত জানা কথা যে, ইংরেজ যখন এসে এ দেশের প্রভু হয়েছিল তখন দেশের কেউ ইংরেজের ইস্কুল কলেজে পড়ে নি।

ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়কে নেতা হয়ে পথ দেখাতে হবে, এ ত নন্-কো-অপারেশনের ব্যাখ্যার টিপ্পনী করে পাওয়া গেল। কিন্তু সে পথ চলেছে কোথায়? এর একটা মোটামুটি পরিষ্কার উত্তর আমাদের চাই-ই চাই। নইলে আমাদের আন্দোলন হুজুগ হয়ে' উঠতে কিছুমাত্র সময় লাগবে না। এবং উত্তর দিতে গেলেই বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষে দুটি আন্দোলন একসঙ্গে সুরু হয়েছে। একটি আন্দোলন ভারতবর্ষের নিজস্ব, আর একটি পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের স্থানীয় প্রকাশ। প্রথমটি 'স্বরাজ' আন্দোলন, —বিদেশী ব্যুরক্রেসির শাসন থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির চেষ্টা। দ্বিতীয়টি দেশের যারা অধিকাংশ সেই জনসাধারণের যুগ-যুগান্তব্যাপী দাসত্ব, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক সমস্ত রকম দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াস। আজ ভারতবর্ষে যারা নেতৃত্ব করবে তাদের ও দুটি আন্দোলনের একসঙ্গে নেতা হতে হবে। এবং প্রথমটির খাতিরে দ্বিতীয়টি নিয়ে খেলা করলে চলবে না। ওর সঙ্গে যাদের প্রাণের যোগ নেই তাদের সকালেই সরে দাঁড়াতে হবে। এবং খুব সম্ভব বিদেশী ব্যুরক্রেসির দলে মিশে তারা একটা নতুন 'ইণ্ড-ব্রিটিশব্যুরক্রেসি'র সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আন্দোলন যে এই দো-রোখা আন্দোলন, অন্তরে তার সাড়া পেয়ে বাঙালা দেশের শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নাগপুর কংগ্রেসের 'স্বরাজ

চাই' এই পণটাকে 'ডেমক্রেটিক স্বরাজ চাই' এই পণে পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। বাকী ভারতবর্ষের কাছে তাঁরা ভোটে হেরেছেন। তা হারুন, কিন্তু বাঙলার মন যে বাকী ভারতবর্ষের পনেরো বছর আগে চলে তাও আবার প্রমাণ হয়েছে।

পৃথিবীজুড়ে আজ শূদ্র মাথা তুলছে। যারা সব দেশে জনসমষ্টির বহু, তারা চিরদিন যারা অল্প—হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য—তাদের দাসত্ব করছে; যারা প্রাণান্ত পরিশ্রমে মানুষের সভ্যতার অন্নময় দেহ গড়ে তুলে তাতে অমৃতময় কোষের সৃষ্টি সম্ভব করেছে, কিন্তু যারা চিরকাল অন্ন ও অমৃত দুই থেকেই বঞ্চিত হয়ে আসছে,—আজ তারা পৃথিবীর অন্নে তাদের প্রাপ্য অংশ দাবী করছে। এ দাবী অগ্রাহ্য করা চলবে না, কেন না শূদ্র আজ দল বাঁধতে শিখেছে। বিধাতা করুন তারা যেন কেবল অন্নেই তুষ্ট না হয়, অমৃতেও তাদের দাবী জানায়; মানুষের সভ্যতা যে জ্ঞান ও আনন্দের সৃষ্টি করেছে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সব দেশে যে স্বল্পশ্রেণী, অন্নের শ্রেষ্ঠ ভাগ ও অমৃতের সমস্তটা নিজেরা নিয়ে এসেছে, তাদের ও-দুই-ই সবার সঙ্গে সমান ভাগ করে' নিতে হবে। হৃষ্টচিত্তে এ না পারলে তাদের ও মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পৃথিবীজোড়া এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে লেগে তার শূদ্র-সমাজকে চঞ্চল করে' তুলেছে। দেশের যারা নেতা হবে তাদের কাজ এই মূক সমাজকে অন্নের দাবীতে মুখর করে তোলা, তাদের প্রাণে অমৃতের পিপাসা জাগিয়ে তোলা। তাদের জানাতে হবে স্বয়ম্ভূ তাদের দাস্তের জন্য সৃষ্টি করেন নি, তারাও "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই কাজের জন্য আজ দেশকে ডাকতে হবে। কেবল পঞ্জাব ও খিলাফতের নামে নয়।

সে ডাকে উকিল-সম্প্রদায়ের ভিতরেও হয় ত সাড়া পাওয়া যাবে; তারা উকিল বলে নয়, মানুষ বলে ও শিক্ষিত মানুষ বলে।

চিঠিটা লম্বা হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করি বলুন। একদিন সিনিয়ার হয়ে ডেলি-ফিতে কাজ করবো ভরসায় অল্প কথাকে লম্বা করবার অভ্যাস করছি। সে অভ্যাসটা অস্থানেও বের হয়ে পড়ে আর চিঠি পড়ে যদি বলেন শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলি নি তবে বুঝব আমার সিনিয়ারির শিক্ষানবিশি সম্পূর্ণ হয়েছে। ইতি

শ্রীজুনিয়র উকিল

গৌরীদানের ফল

—*—

সনাতন চাটুয্যে অতি তুখোড় লোক, এমন পলিসিবাজ আর দুনিয়ায় দুটো হয় না। তবে সাধারণত দেখা যায় লোকে পলিসি খাটায় ইহলৌকিক ব্যাপারে, কিন্তু সনাতন খাটাতেন পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য, বোধ হয় এই পারলৌকিক ব্যাপার সব পরার্থে উদ্দীপনাজনিত নয়, নিজস্বার্থে উৎসাহজনিত। সনাতনের জ্ঞান হওয়া থেকে বরাবর দৃষ্টি ছিল যে স্বর্গটা কিছুতেই যেন হাত-ছাড়া হ'য়ে না যায়। তাই স্বর্গে যাবার যত রকম কায়দা সংস্কৃতে লেখা আছে তা ছিল সনাতনের কণ্ঠাগ্রে ও নখাগ্রে। গয়া গঙ্গা গদাধর কারোই, রঘুনন্দন চাটুয্যের পৌত্র ও পরাশর চাটুয্যের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সনাতন চাটুয্যের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ বা অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না। আর সেইজন্যে সনাতন ভাবতেন যে আর সবাইকে যদি বৈতরণী পার হ'তে হয় সাঁতরে, তবে তাঁর জন্যে তৈরী হ'য়ে থাকবে অন্তত পক্ষে একটি ময়ূরপঙ্খী, খুব কম করে' হলেও এক শ' দাঁড়ের। সনাতনের মনে যে অধিকতর দ্রুতগামী ষ্টীমলঞ্চ বা মোটর লঞ্চের কথা উঠত না, তা নয়। তবে একালের ম্লেচ্ছের আবিষ্কারগুলো সেকালের ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনিয়ারের আবিষ্কৃত বৈতরণীর বুকে চলবে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহের বিরাম ছিল না।

সনাতনের বনে যাবার বয়েস ধর ধর, এমন সময় একদিন তাঁর

মনে হল যে, স্বর্গে যাবার সব রকম পুণ্যের টিকিটই তাঁর সংগ্রহ করা হ'য়ে গেছে, শুধু গৌরীদানের পুণ্যের টিকেটখানিই কেনা হয় নি। সেই বয়েসে এই কথাটা সনাতনের মনে হওয়ার একটা কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, সেই সময়ে তাঁর সবার ছোট মেয়েটি সাত পেরিয়ে ঠিক আটে পা দিয়েছে। সনাতনের বয়েসটাও ধাঁ ধাঁ করে' এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সনাতন মনে মনে বললেন—না, গৌরীদানের পুণ্যটা বাকি রাখা কোন কাজের কথা নয়।

সনাতনের যে কথা সেই কাজ। বছর ফিরতে না ফিরতে বিধবা তারাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র রমেনের সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে লতিকার শুভ বিবাহটা সুসম্পন্ন করে স্বর্গে যাবার সনন্দখানি একেবারে মনের পকেটে পুরে রাখলেন।

(২)

রমেন ছিল বিধবা তারাসুন্দরীর একমাত্র ছেলে। তেইশ বছর বয়সে দু' দু' বার বি,এ, ফেল করে' বাড়ীতেই বসে' ছিল। সুতরাং এই সুযোগে মা ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনলেন।

বিবাহ ইত্যাদির সম্বন্ধে রমেনের যে মতামত কি ছিল তা কেউ জানত না, তবে কিছুদিন থেকে যে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে গুণ্ গুণ্ করে' রবি বাবুর বাছা বাছা প্রেম সঙ্গীতগুলোর মক্স করত, সেটার সম্বন্ধে কেউ কেউ সাক্ষী দিতে পারত। তা ছাড়া বার্ণস্ ও ব্রাউনিং-এর কোন কোন লাইন যে তার হৃদয়টা দুলিয়ে যেত না সেটাও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না।

সুতরাং এ-হেন রমেনের শয্যাপ্রান্তে যেদিন তার অষ্টম বর্ষীয়া

বধূটি এসে একটি কাপড়ের পুঁটুলির মত হ'য়ে স্থান গ্রহণ করল সেদিন রমেনের হৃদয়টা তোলপাড় করে' উঠল অনেকখানি। তারপর তার হৃদয়ের রক্ত তার মাথার দিকে এবং মাথার রক্ত তার হৃদয়ের দিকে অনেকবার যাতায়াত করার পর যখন সে সাহস সঞ্চয় করে' নববধূর একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"লতি, আমায় ভালবাসবে?" তখন সে আবিষ্কার করল যে লতি অবগুণ্ঠনের নীচে কাঁদছে, সে প্রশ্নে লতির কান্না দ্বিগুন বেড়ে গেল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লতি উত্তর দিলে, "মা ছাড়া আর আমি কাউকে ভালবাসব না।" রবীন্দ্রনাথ, বার্ণস, ব্রাউনিং সব জড়িয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে রমেনের বুকের মধ্যে এমনি একটা জমাট আঁধার বেঁধে উঠল যে, তার মধ্যে রমেনের নিজের মন বুদ্ধি চিত্তও একেবারে লয় পেয়ে গেল, রইল যা তা কেবল ফিউচারিস্টদের একখানা জোরাল ছবি।

(৩)

তার পর দিন রমেনের হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হ'ল। রমেন মাকে বললে—"মা আজকাল যে রকম দিন পড়েছে তাতে আর যেটুকু জমি জমা আছে তাতে চলবে না। সুতরাং চাকরি বাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে পড়া সমীচীন।" মায়ের অনেক অনুযোগ অভিযোগ ও অশ্রুজল হেলায় জয় করে' রমেন অতি দূরদেশ বীরভূমে তার এক দূর সম্পর্কিত চাকুরে-কাকার কাছে চলে' গেল।

কাকা মহাশয় রমেনের এই রকম হঠাৎ চাকরি করবার মত মতি দেখে যুগপৎ পুলকিত ও আনন্দিত হ'য়ে উঠলেন। কাকা

মহাশয়ের সাহেব সুবোর কাছে একটু প্রতিপত্তি যে না ছিল তা নয়। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই রমেনের চল্লিশ টাকা মাইনের এক কেরানীগিরি জুটে গেল।

চাকরী পেয়ে রমেন মাকে জানাল। মা লিখলেন, "বৌকে নিয়ে যা।" রমেন উত্তরে লিখল, "মাইনে একটু বাড়ুক।" মা লিখলেন, "পূজোর বন্ধে বাড়ী আসিস্।" রমেন লিখলেন, "এত দূরদেশ থেকে বাড়ী যেতে আসতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ। ঐ বাজে খরচটা এখন না করে টাকাটা জমিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।" এতে মায়ের যে কত দিন কতখানি অশ্রু ঝরল তা রমেনের অজ্ঞাত রয়ে গেল।

দেশে অনেকগুলো কল আছে। যেমন ট্যাকশাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ওকালতি, কেরানীগিরি। এই সব কল থেকে এক একটা টাইপ তৈরী হয়। ট্যাকশালে যেমন যে-ধাতুই গলিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন, তার একদিকে রাজার মুখের ছাপ আর একদিকে সন তারিখ নিয়ে চেপ্টা হ'য়ে বেরিয়ে আসে, কেবল তাদের বাজারে একটু মূল্যের বেশ কম নিয়ে, তেমনি কেরানীগিরি কলে যত রকম ধাতুর মানুষই ঠেলে দেওয়া যাক্ না কেন কিছু দিন পরে' তাদের হাব ভাব ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ মন দেহ প্রায় এক রকমই দাঁড়িয়ে যায়; তবে বাজারদরে প্রভেদ থেকে যায়।

আটটি বছরে রমেন পাকা কেরানী হ'য়ে উঠেছে। সে যে একদিন রবিঠাকুরের প্রেমসঙ্গীত গুন্ গুন্ করে' গান করত, তা আজকাল তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বার্ণস-এর নাম শুনলে আজ তার মনে হয় ও-পদার্থটা স্কট্‌ল্যাণ্ডের পাহাড় কি অস্তরীপ কি অমনি একটা

কিছু হবে। আট বছরের প্রতিদিন, ঘণ্টা আষ্টেক করে' কলম পিষে তার দু চোয়াল জেগে উঠেছে চক্ষু দুটো ভিতরে নেমে গেছে, একত্রিশ বছর বয়সে এমন কি তার বাঁ কানের পাশ দিয়ে দুটো পাকা চুল পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কিন্তু রমেন বেশ আছে, চল্লিশ থেকে তার মাইনে ষাটে উঠেছে।

এমন সময় এক দিন বিধবা তারাসুন্দরী লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাইচরণ খুড়োর সাথে রমেনের কর্ম্মস্থলে এসে উপস্থিত। রমেন মনে ভাবলে মন্দ কি, এইবার খাওয়া দাওয়ার একটু সুরাহা হ'তে পারে।

রমেন প্রায়ই আপিসের খাতাপত্র নিয়ে এসে বাসায় কাজ করত। সেদিনও রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে' এসে নিজের শোবার ঘরের টেবিলের উপরকার বাতিটা উজ্জ্বল করে' দিয়ে চেয়ারে বসে' রাশি রাশি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব একমনে দেখে যাচ্ছিল, এমন সময় খাওয়া শেষ করে' তার ষোড়শী স্ত্রী লতিকা ঘরে প্রবেশ করল। লতিকার বয়েস যত বাড়ছিল ততই তার স্বামীর আট বছর আগের একমাত্র প্রশ্নটি তার হৃদয়ের অন্তস্থলে একটা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীর-ফলকের মত স্থূল থেকে স্থূলতর হ'য়ে উঠছিল। আজ সে এসেছিল তার সমস্ত মন প্রাণ নিয়ে একটি জীবনকে নিঃশেষে উজাড় করে' ঢেলে দেবার জন্যে। আজ লতিকার মনের সুষমা তার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে গেছে, তার প্রাণের পুলক-স্পন্দন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চারিয়ে গেছে। ষোড়শী স্ত্রী এসে রমেনের চেয়ারের একটি হাতল ধরে' রমেনের পাশে দাঁড়াল, রাজ্যের রক্তিমাভা তার কপোলে জড়িয়ে। টাকা-আনা-পাই-য়ে ব্যস্ত-রমেন একবার খালি মুখ তুলে

চাইল, তারপর তার বাঁ কানের পাশে যেখানে দুটো পাকা চুল এসে ঝুলে' পড়েছিল সেইখানে চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে তার বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল চালাতে চালাতে বললে, "আমাকে এখন আর disturb করো না, এ-কাগজ আমাকে কালই দাখিল করতে হবে।" লতিকার কপোলের রক্তিমাভা একমুহূর্ত্তে একেবারে পাঁশুটে হয়ে গেল, লতিকা ধীরে সরে' গেল। তার বুকের মধ্যে নেমে এল একটা জমাট বাঁধা আঁধার আর তার চোখের সামনে বিছিয়ে গেল একটা সীমাহীন শেষহীন নিষ্ঠুর মরুভূমি—যেখানে চারিদিকে কেবল বিরতি-হীন মৃগতৃষ্ণিকা।

সেই সময়টাতে প্রায় ষাট বছরের এক বৃদ্ধ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে শুনছিলেন বৈতরণীর বুকে ময়ূরপঙ্খীর একশ' দাঁড়ের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্তি

——:০:——

ওগো তুমি এলে আজ
মহারাজ!
নয়নে শ্রবণে,
শ্রাবণের শ্রমহীন অজস্র স্রবণে
পশিলে বন্যার সম
বিহ্বল চেতনাকুল জাগরণে মম।

আবেগ-বিকম্পিত বাসরের রাতে,
তোমার নয়ন-পাতে,
অপূর্ণ বিদীর্ণ হিয়া
যেদিন ক্ষণেক তরে উঠিল গো শিহরিয়া—
সেদিন আমার
ভিখারী নয়নাসার
সম্বল ছিল গো বঁধু।

অন্তরে নিভৃততম যত রস মধু
উৎসের গতিতে
পারেনি ক্ষরিতে
তৃষ্ণার্ত্ত নয়নের তৃপ্তিহীন পথে।

সে প্রথম মিলনের শুভদিন হতে,
প্রতি দিন প্রতি রাতি,
জ্বালায়ে স্মৃতির বাতি,
ক্লান্তিহীন বেদনার পরিপূর্ণ সুখে
যাপিয়াছি প্রতিক্ষণ ভাষা-হীন মুখে।
বিরহের গুরুভারে টুটিল হৃদয়—
তবুও তোমার দেখা পাইনি নিদয়!

আজ একি! বিস্মৃতির প্রথম ইঙ্গিতে,
নিদ্রাহীন সাগরের কলকণ্ঠ গীতে
ছাপিয়া সকল বাধা, পশিলে পরাণে,
অন্তর ভরিয়া দিলে অমরার দানে!

নিখিল করিয়া তুচ্ছ চেয়েছি যখন,
পাইনি, দাওনি দরশন।
ভুলিতে বসিনু যবে—সেই শুভক্ষণে
পরশ করিয়া গেল পরশ-রতনে!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

বাঙালী যুবকের মনের কথা

—:*:—

গত অগাষ্ট মাসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসে, তখন জনৈক ভারতপূজ্য অ-বাঙালী স্বদেশী-নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "বাঙলার ভাবের ধারা এখন কোন্ দিকে বইছে?" উত্তরে আমি বলি যে, "তার সন্ধান নিতে হবে বাঙলা সাহিত্যে,—বাঙালীর মুখের কংগ্রেসী-বক্তৃতা কিম্বা বাঙালীর লিখিত ইংরাজী সংবাদপত্রে নয়।" এ উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে প্রশ্ন করলেন, "এক কথায় বলতে পার না?" এর উত্তরে আমি বলি, "আমার মনে হয় যে, আমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমরা নিজেরাই যে অনেকটা দায়ী, এই সন্দেহ বাঙালীর মনে উদয় হয়েছে। সুতরাং আমাদের মামুলী রাজনৈতিক বুলিগুলি বাঙালীর মনে আর তেমন করে ঘা দেয় না।"

এ উত্তর শুনে তিনি এতটা বিরক্ত হয়েছিলেন যে, আমাদের কথোপকথন আর বেশি দূর এগলো না।

বাঙলার ভাবের ধারা কোন্ দিকে বইছে, তার পরিচয় নিতে হলে অবশ্য বাঙলার যুবক-সম্প্রদায়ের মনের দিকে নজর দিতে হবে। এ কথার মানে এ নয় যে, যুবকমাত্রেরই মনে নবভাবের সাক্ষাৎ মিলবে। তার সাক্ষাৎ মিলবে শুধু সেই সব যুবকের মনে, যারা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে জানে, নিজের মন দিয়ে ভাবতে জানে। এ শ্রেণীর যুবকেরা যে আমাদের ইংরাজী শিক্ষিতসমাজের নানারকম সত্যমিথ্যা বুলি আজকের দিনে বিনা বিচারে গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত নয়, তার প্রমাণস্বরূপ আমি তিনটি যুবকের তিনখানি পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করছি। বলাবাহুল্য এ পত্রগুলি আমার ছাড়া অপর কারও চোখে যে কখনো পড়বে, এ কথা লেখকেরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং এ সব লেখার

ভিতর কোনরূপ ভাণের লেশমাত্র নেই। এঁদের বক্তব্য কথা যেমন অকপট, তেমনি সরল।

প্রথম পত্রের লেখক গত বৎসর বি,এ, পাশ করে এখন বি,এল্, পড়ছেন।

দ্বিতীয় পত্রের লেখকের নাম গোপন করবার চেষ্টা বৃথা, কেননা উক্ত পত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয় ফুটে বেরিয়েছে।

তৃতীয় পত্রের লেখক বাঙলার বাইরে হিন্দুস্থানীর দেশে কোনও কলেজে এখন বি,এ, পড়ছেন।

বাঙলায় যারা ভাবে, তাদের ভাবের ধারা যে গভীরতা লাভ করছে, পাঠক-মাত্রেই প্রথম ও তৃতীয় পত্রে তার স্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার কেনা-বেচার দিক নয়, মানসিক দিকটার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেবার জন্য একদল বাঙালী যুবকের মন যে ব্যগ্র হয়েছে, তার পরিচয় শ্রীমান দিলীপকুমারের পত্রে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সভ্যতার সস্তা সমালোচনা যে খেলো মন থেকে বেরয়, অতবড় একটা জীবন্ত সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা যে অজ্ঞতাপ্রসূত, এ জ্ঞান দেখতে পাই আরো পাঁচ জন বাঙালী যুবকের মনে জন্মেছে। যে আত্মজিজ্ঞাসা সকল আত্মজ্ঞানের মূল, সে আত্মজিজ্ঞাসা যে বাঙলার নবীন মনেও উদয় হয়েছে, এর চাইতে আর বেশি কি আশার কথা হতে পারে?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

৯-১১ ২০

* * * *

প্রায় প্রতি জেলার প্রতি গ্রামেই খুব জ্বর হচ্ছে ও লোক মারা যাচ্ছে। আমার ধারণা এ মৃত্যুর মূলে কেবল রোগকে স্থান দিলেই যে

চলবে তা' নয়। এই বাঙালী জাত প্রায় একশ' বছর ধরে খেতে পায় না। সত্যিই খেতে পায় না। যা পায় তা'তে পেট কারো ভরে, আর কারো সেটিও হয় না। তারপর সে খাদ্যগুলি পেটকেই ভরায়, শরীরকে তাজা করে না; কাজেই রোগের সঙ্গে যুঝে ওঠা সাধারণের দায়। খেতে যারা পায় না তাদের ঘরের অবস্থা যে কি শোচনীয়, কি দুঃসহ দুঃখের আধার, তা বলে শেষ করা যায় না। আর সেই সঙ্গে তাদের নেই রেস্ত, যে ডাক্তার ডেকে ওষুধ কিনে খায়। কাজেই সাধারণ লোক ও তথাকথিত মধ্যবিত্তের অবস্থা হতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে তাদের মানুষ হয়ে জন্মাবার সুখটা কতখানি! আমাদের এই গ্রামে বর্ষার দু'মাস ছেড়ে দিয়ে আর দশটি মাস দুধের সের হয় তিন পয়সা, আর মাছ পাওয়া যায় প্রচুর, এবং তার মূল্যও যৎসামান্য। বোধ হয় তিন আনার মাছ কিনলে দশ জনের খাওয়া মন্দ চলে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে গড়ে মাছ কেনার জন্য মাথাপ্রতি এক পয়সার কিঞ্চিৎ বেশি লাগে। এ খরচটাও তারা পুষিয়ে উঠতে পারে না। তাদের বাঁচবার আশা কি থেকে হবে? এদের ভগবানের কাছে বোধহয় প্রার্থনা এই যে, এরা শীঘ্রই যেন পরপারে যাত্রা করতে পারে। Reform যদি করতেই হয়, তবে এইদিকে খাবার বন্দোবস্ত করে জাতকে বলবান করে তুলে, তবে তার অপর উন্নতি করতে হবে। আমার এই মত। এই জাত যদি খেতে পায়, তবে আবার বর্ত্তমান যুগের আলোতে জেগে উঠবে। আর তা যদি না পায়, তবে এরা খেতে-না-পাওয়া বাঘের মত হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে একটা বিরাট কাণ্ড বাধাবে। তাদের মুখের গ্রাস কেমন করে এবং কোথায় চলে যায়, সেইটুকু বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে

হবে। এ কাজ বোধকরি এ পর্য্যন্ত কোন পলিটিসিয়ানই তেমন ক'রে করেন নি, ও শীঘ্র যে করবেন তাও মনে হয় না। অমৃতশহরে যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটেছে, সে বিষয়ে ভারতীয় জন-সঙ্ঘের মতভেদ নেই, কিন্তু কতলোক যে প্রতিদিন এই সোনার ভারতে না খেতে পেয়ে, অকালে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পিছনে ফেলে, চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে, সেইটুকু ভেবে প্রতিকারের চেষ্টাটা কেউ তেমন ভাবে করেন নি। এই খেতে না-পাওয়ার ফলে মানুষ যে অদ্ভুত মরিয়া হয়ে জাগরণের সাড়া দেয়, তা কামড়ে ধরার মত ভয়ঙ্কর; আজ সেই সাড়ার একটা ক্ষীণ স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। সেটা অনেকটা হুজুগ হলেও কাজের। আমি বলছি এই বর্ত্তমান strike-এর ধারা দেখে। এরাই দেখাচ্ছে যে, co-operation-এর মস্ত বড় একটা শক্তি আছে, এবং এই শক্তিটাই তাদের উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যে বেড়ে গিয়েছে, তাতে আপাতত দুঃখ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, কষ্টও যে সবার কম হচ্ছে তা নয়; কিন্তু এর ফল যা হচ্ছে ও হবে, সেটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় খুবই ভাল, এবং তার ফলে যে জাগরণ হবে সেটা কল্পনায় এত আশা-প্রদ ব'লে মনে হয় যে, তাতে বর্ত্তমানের দুঃখটা ডুবে যায়। পেট যদি ভাল করেই ভরতো, তবে আজ বাঙালী বিদেশে ছুটত না,—নাক-ডাকিয়ে নিশ্চয়ই ঘুমতো!

ভারতের প্রায় সব প্রদেশই ব্যবসা করে ঘরে টাকা আনছে, শুধু বাঙলা আর মাদ্রাজ বাদে। এদেরও বর্ত্তমানের চালচলনটা আর মাষ্টারী, ওকালতী আর চাকরীতেই শেষ হচ্ছে না। Enterprising spirit-টা খুব ধীরে ধীরে বাঙলায় ঢুকছে। এটাও কিন্তু উপরের লিখিত উপায়ে, পয়সা জোটে না দেখে, না-খেতে পেয়ে মরবার ভয়ে হচ্ছে। এ দিকের যাঁত্রাটা কি খুবই আশাপ্রদ নয়?

প্রায় পনেরো দিন পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে এসে একটি প্রজা জানালে যে, তাদের পাশের বাড়ীতে একটি লোক বড়ই কাতর। দাদা ডাক্তারী পাশ করে বাড়ীতে এসেছেন। তাঁকে দেখতে পাঠানো হল। তিনি দেখে এসে বললেন যে, রোগটা হচ্ছে না খেতে-পাওয়া। তখন তার ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু হতভাগা আর বাঁচল না। এই মৃত লোকটির দুটি পুত্র ও স্ত্রী আছে। এদের এখন দেখবে কে? কিবা তাদের ভূষণ, আর কিবা তাদের শ্রী! প্রবাসীর বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের ফটোতোলা চেহারাকেও হার মানিয়ে নিশ্চয়ই দেবে! এদের জল খাবার ব্যবস্থাটুকুও নেই, ভাত ত দূরের কথা! আমি বলি এইরকম হিসাবের খাতা গড়ে তুলে, খতিয়ান করে দেখলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষের কষ্ট দূর করবার জন্য যে সব Moderate or Extremist-রা নানা ছন্দে, নানা প্রকারে, গলা উঁচু ও নীচু করে সুর ধরেছেন, সেটা নাম জাহির করবার জন্যই, প্রকৃত দুঃখকে দূর করবার মোটেই চেষ্টা হয় নি বা হচ্ছে না। যদি কেউ এদিকে দৃষ্টি দেন, তবে তাঁকেই ভারতের প্রকৃত হিতৈষী বলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

* * * *

(২)

Randolph Hotel, Oxford.
16-11-20

* * * *

আমি পরশু সন্ধ্যায় এখানকার 'মজলিসে' "সঙ্গীত রজনী" নামক আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে, এখানকার ছাত্রবৃন্দের অতিথি হয়ে এই হোটেল-টাতে আছি। গান করতে জানলে ব্রাহ্মণভোজনের সুবিধা কেবল যে আমাদের দেশেই হয় তা নয়, এখানেও তার অভাব হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতটা একটু শিখেছিলাম বলেই যে আজ এতটা আদর পাওয়া যাচ্ছে, এ ভেবে আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেব না পরিণাম-দর্শিতারূপ পুরুষকারকে ধন্যবাদ দেব, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পাচ্ছি না। সে যাই হোক, অক্সফোর্ড-এ এসে এখানকার ছেলেদের শাস্ত্রানুমোদিত অতিথি-সেবাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, এ কথা বলতেই হবে, যদিও কোনো বিষয়েই অক্সফোর্ডের শ্রেষ্ঠতা মেনে নেওয়া আমাদের (অর্থাৎ—কেমব্রিজিয়ানদের) পক্ষে নিতান্তই un-constitutional !

এখানে গত পরশু ইংরাজ শ্রোতা ও শ্রোত্রীও অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুই একজনের আমাদের সঙ্গীত ভাল লেগেছে মনে করা অসঙ্গত নয়। বিশেষত একজন ছোটখাট Composer (ছাত্র অবশ্য) যখন মহা উৎসাহের সঙ্গে আমার গান শোনার পর আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে সুরু করে দিলেন, তখন মনে হল যে, এ দেশটাকে আমাদের সঙ্গীতের একটু ভাল নমুনা যদি সত্যি সত্যিই দেওয়া যায়,

তবে হয় ত নিতান্ত অরসিকে রসের নিবেদন গোছ না হতেও পারে। সুইটজরল্যাণ্ডে M. Romain Rolland মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর যখন দেখলাম যে, তিনি একদিন নয়, রোজই আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গান শুনতে চাইতেন, এবং যখন তিনি আমাদের সঙ্গীতের ঔৎকর্ষ্য সম্বন্ধে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, তখন মনে হল যে, হয় ত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের মধ্যে বিশ্বজনীন কিছু থাকতেও পারে,—যদিও আমি এতদিন ধরে অন্যরকম মনে করে এসেছি। আমার মনে হত (এবং এখনও যে হয় না, তা নয়) যে কোনও শ্রেষ্ঠ আর্ট বুঝতে হলে তার চর্চ্চা (সে active-ই হোক, আর passive-ই হোক) কিছুদিন ধরে করা দরকার; এবং শুধু যে দরকার তাও নয়, এ না হলে তাতে কোন প্রবুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারাই সম্ভবপর নয়। এখন আমার এ মতের আংশিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। M. Romain Rolland লিখেছেন যে, যদিও সাধারণের পক্ষে এ কথা খাটে, কিন্তু যারা সত্য সত্যই সঙ্গীত-বেত্তা ও বোদ্ধা, বাস্তবিক উঁচুদরের সঙ্গীতের বিশ্বজনীনতাটা তাদের কানে অনুরণন তুলতে বাধ্য; যদিচ আমরা আমাদের সঙ্গীত থেকে যে ভাবে রসগ্রহণ কর্ত্তে সক্ষম, তাঁরা হয় ত ঠিক সে ভাবে রসবোধ কর্ত্তে পার্ব্বেন না। এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় না হতে পারলেও, এর মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে তা আমার অল্প অভিজ্ঞতাতেই মনে হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সঙ্গীত যাতে এদেশের লোকে শোনবার সুযোগ পায়, সে পক্ষে ত আমাদের দেশ থেকে চেষ্টা হওয়া উচিত। এ পক্ষে স্বরলিপিই একমাত্র সহায়, এবং আমাদের সঙ্গীতের চরম মাধুর্য্য এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেই য়ুরোপে প্রচার করা কর্ত্তব্য। M. Rolland

আমাকে এ কথাই বলছিলেন। আমাকে তিনি একটু ভাবিয়ে দিয়েছেন, এবং এ দেশের এই অল্পবিস্তর appreciative spirit-টাতে আমাকে একটু বিচলিত হতে হয়েছে। আপনারা এ পক্ষে কোনও চেষ্টা করেন না কেন? M. Rolland আমাকে বলছিলেন যে, ফ্রান্সে অনেক সঙ্গীতের মাসিক পত্রে আমাদের সঙ্গীতের নমুনার খুবই আদর হবে, বিশেষত যখন আমাদের সঙ্গীতটা এতই মহান্। আমি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু contribution করবার আশা রাখি। এই জন্য আমি আজকাল য়ুরোপীয় সঙ্গীতটা মন দিয়েই শিখতে আরম্ভ করেছি। তবে এখন বুঝেছি যে, উপর উপর শেখাটা কিছু নয়, একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করাটা বড় দরকার। সে জন্য আজকাল আমাকে একটু খাটতে হচ্ছে। Mus. Bach.-এর Part I-এ আমি আগামী জুনে পরীক্ষা দেব। এখন এখানে Theory of Music-টা ভাল করে পড়ান হয়। সেটাও ভাল করে শেখবার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কতদূর কি হয়। দেশে ফিরে নানাদেশে বছর দুই ধরে ঘুরে আমাদের সঙ্গীতটা আরও ভালকরে শেখবার সঙ্কল্পটা ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হচ্ছে। তবে আমাদের প্রধান দোষ হচ্ছে অধ্যবসায়ের অভাব। আমরা মনে করি talents থাকলেই বুঝি সব হয়ে গেল। এদের দেশে সঙ্গীতে (শুধু সঙ্গীতে কেন, সব বিষয়েই) যারা উচ্চাশী, তারা পরিশ্রম করে অসাধারণ। এদেশের এ spirit-টা যদি শিখে যাওয়া যায়, তা'হলে একটা মস্ত কাজ হয়। দুঃখের বিষয় আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই এখানে বহুকাল বাসের পর bow-টা ভালকরে বাঁধতে শিখে আত্ম প্রশস্তি বোধ করে থাকেন। অতুল গুপ্ত মহাশয়ও তাঁর "বৈশ্য" প্রবন্ধে লিখেছেন যে, য়ুরোপের

প্রাণের ও গভীরতার দিকটা আমাদের মধ্যে কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব'লে প্রমাণ হয় না যে, তার সে দিকটাই অবিদ্যমান,—না এমনি একটা কথা। কথাটা খুব ঠিক। আমার কাছে এঁদের এই উদ্যম অধ্যবসায় ও প্রাণশক্তির স্পন্দনটা খুব ভাল লাগে। বিশেষত আমাদের মত অবসন্ন জাতের কাছে এ দেশের নিকটপরিচয়ের (উপর উপর পরিচয় নয়) খুবই দাম আছে মনে করি। তবে অনেকের কাছেই এ দেশের সম্বন্ধে সস্তা প্রতিবাদ শুনে শুনে আজকাল আর প্রতিবাদ কর্ত্তে ইচ্ছে যায় না। কারণ এ দলের সমালোচকগণ কথা কিছু শেখবার জন্য বা শোনবার জন্য বলেন না, বলবার জন্যই বলেন। আমিও নিঃশ্বাস-সঞ্চয়রূপ নীতিকে বিশ্বাস করি বলে, বিরাট ennui-এর সঙ্গে অনর্গল শুনে যাই; কিন্তু তা যে কতটা কষ্টের সঙ্গে, তা বুঝতে পার্ব্বেন আমার ennui কথাটির ব্যবহার দেখে।

* * * *

(৩)

৮।১০।২০

* * * *

এখানেও মাঝে নন্-কো-অপারেশন নিয়ে খুব খানিকটা গোলমাল চল্ল। কয়েকটি ভদ্রলোক এখানে এসে মিটিং করে বক্তৃতা দিয়ে, আর কিছু না করুন শহরের এবং কলেজের অনেকের মাথা গোলমাল করে দিলেন। খুব খানিকটা "দেশভক্তি"র বিষয় বড় বড় কথা শোনা

গেল, এখন আবার সমস্ত যা ছিল তাই হল—কোনোখানে কোন সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত নেই। আমার এই সমস্ত দেখেশুনে ধারণা হয়েছে যে, কোন গোলমালে কিছু হবে না, ভিতর থেকে জড়ত্বের দাসত্বের বন্ধন না ঘুচলে, বাহির থেকে মুক্তি আসতেই পারে না। আমরা যতদিন না কুসংস্কার-মুক্ত, কর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় হব, ততদিন জাতীয় উন্নতি যে কি করে হবে তা আমি বুঝতে পারি নে। আমার মনে হয় মুক্তি কেবল আসতে পারে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি থেকে, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মত্যাগের প্রেরণা আসে, যে উচ্চ-আদর্শ লাভের আকাঙ্খা জাগরিত হয়, তার ভিতর দিয়ে। যতদিন সেই ভাব না আসবে, ততদিন সকলে নিশ্চিন্ত মনে চিরকাল শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বন্দ্ব দ্বেষ তর্কবিতর্ক দলাদলি নিয়ে দিন কাটাবে। পলিটিক্যাল তর্ক করেই বা লাভ কি?—উত্তেজক পানীয়ের মত পলিটিক্সের একটা নেশা আছে, এতে মানুষের মনে একটা সাময়িক উন্মাদনা আনে, তার perspective একেবারে উল্টে দেয়, সে ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্যের পার্থক্য দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলে;—কি জন্যে সে এত উত্তেজিত হয়ে নিজের এবং অন্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে তাও ভুলে যায়, এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশের ও দেশ-ভক্তির নামে যত অনিষ্টসাধন করে। আমাদের দেশের লোকেরও সেই অবস্থা হয়েছে। প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত মুক্তিলাভের ইচ্ছা তার নেই; সে কেবল নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য, বুদ্ধি-বৃত্তির নানারকম চাতুর্য্যের দ্বারা ছোট ছোট জিনিসকে বড় এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেই নিজের সমস্ত শক্তি খরচ করে ফেলছে, এবং পরম দেশহিতৈষী বলে তার ভক্তবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করে

নিজের এবং অন্যের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করছে। এখনকার এই দুঃসময়ে মানুষের মধ্যেকার যা-কিছু চিরকালের, যা-কিছু অ-মলিন, সে বিষয় কোনো কথা বলতে গেলে উপহাসাস্পদ হতে হয়। তুচ্ছ জাত বা মতামতের পার্থক্যকে অবজ্ঞা করে সকলের প্রতি সমভাবের কথা, করুণাময় স্নেহপ্রবণতার কথা বলতে গেলে, বা সরলতা দয়া ঔদার্য্য ক্ষমা ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে, লোকের চোখে হেয় হয়ে যেতে হয়। সকলে মনে করে, এর দেশের প্রতি টান মোটেই নেই, এ এখনও এই সব "সেকেলে" কথা বলতে লজ্জা বোধ করছে না, কারণ এ জানে না যে ঐ সব দয়া দাক্ষিণ্য করুণা, ত্যাগস্বীকার করা, এইসব "ভাল মানুষী"র যুগ এখন কেটে গেছে; প্রকৃত "পৌরুষ," অর্থাৎ—বীরের মত অন্যের সুখদুঃখের দিকে না তাকিয়ে, আপনার কামনার সিদ্ধি করার যে আনন্দ, মাতৃভূমির যথার্থ সন্তানের মত বিদেশী দেখলেই তাকে নিপীড়িত করে অপমানিত করে শক্তি প্রয়োগ করে যে নির্ম্মল সুখ—এ-সব এ জানে না বোঝে না। আমি আমাদের বাঙালী যুবক অনেক-কেই দেখেছি, অনেকের মধ্যেই এই ভাব ঢুকেছে। অনেকে বহুদিনের সুপ্তি থেকে হঠাৎ জেগে উঠেই স্বাধীনভাবে সংযতচিত্তে কিছু চিন্তা না করে "দেশের কাজ" করব বলে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে আর যাই হোক চেঁচামেচি গোলমালের অন্ত নেই। এর জন্যে দোষই বা দেওয়া যায় কাকে?—কারণ দেশের যাঁরা নেতা বলে প্রসিদ্ধ, তাঁরা কি নিজেদের জীবনে, কি লেখায় বক্তৃতায়, কোনদিকেই এমন একটা আদর্শ ধরে দিতে পারছেন না, যাতে দেশবাসীর মনের উপর কোনো প্রভাব হতে পারে, তাদের হৃদয়মন দেশের প্রকৃত সেবার দিকে

নিয়ন্ত্রিত হয়। যার যতটা শক্তি সে কেবল অশান্তির ধূলো ওড়াতেই খরচ করে ফেলছে, এতে সত্যদৃষ্টির সম্ভাবনা আরো সুদূর হয়ে পড়ছে; এই কলুষিত অন্ধকার আবহাওয়ার বাহিরে যে এক রৌদ্রালোকিত নির্ম্মল শুভ্র গগন আছে, এই হিংসাদ্বেষপূর্ণ জীবনই যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে চরম সত্য নয়, সে কথা সকলের কাছে স্বপ্নরাজ্যের অভাব্য কাহিনীর মত মিথ্যা হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা শান্ত সুন্দর মঙ্গলময় আদর্শ সর্ব্বদা চোখের সামনে না থাকলে, কোনো গোলমাল কোনো আন্দোলনই যে সুফল আনতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে। মাঝে ঐ গোলমালে আমিও দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম, ধোঁয়ায় ধূলোয় অন্ধকারে আমার প্রকৃতদৃষ্টি হরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু এখন ক্রমেই আমার বিশ্বাস বদলে যাচ্ছে। নিজের আত্মার বন্ধন ঘোচাতে চেষ্টা না করে, নিজের মনকে সত্যের আলোয় পরিপূর্ণ করতে প্রয়াস না করে, কেবল বাহির থেকে মুক্তি চাওয়া যে কতদূর নিস্ফল, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এখনও আমরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থহীন প্রথার বন্ধনকে সানন্দে সগৌরবে বরণ করে ধর্ম্মের নামে যত অত্যাচার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছি—আমাদের মুখে মুক্তির কথা শোভা পাবে কি করে? "নীচু জাত" হলে তার সঙ্গে আহার করা কেন, তার ছোঁয়া জল গ্রহণ করা, তার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করাকে আমরা ধর্ম্মের নামে মহাপাপ জ্ঞান করি—"অস্পৃশ্য জাত" হলে তার মৃতদেহ সংস্কার করাকে আমরা ধর্ম্মের নামে বারণ করতে দ্বিধা বোধ করি নে; অসবর্ণের মধ্যে বিবাহের কথা হলে আমাদের দিগ্বিদিকজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়; বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে পথের ভিখারী করে দিয়ে নির্লজ্জভাবে পণ গ্রহণ করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধে না;

স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনলেই ঘরে ঘরে মেয়েদের পতিভক্তি কমবে, হিন্দু-রমণীর যে গৌরব—কায়মনোবাক্যে দাসীর জীবন যাপন করা—সে-ও বা টিঁকবে না, এই ভয়েই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি; কোন্ দিন কোন্ প্রহরে কোন্ দিকে মুখ করে কি ভাবে কি খেলে পুণ্য হয় বা পাপ হয়, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা;—আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকের সম্বন্ধে যদি এই সব সত্য হয়, তবে আমাদের পক্ষে জগতের স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়ানোর আকাঙ্খা দুরাকাঙ্খামাত্র। এই যুগযুগসঞ্চিত পুঞ্জিত আবর্জ্জনা দূর করতে হবে, দেহে মনে কর্ম্মে চিন্তায় স্বাধীন হতে হবে, তাহলে বাইরের দেওয়া স্বাধীনতার জন্যে আমাদের আর কাঁদতে হবে না, মুক্তি আপনিই এসে পড়বে।

এই ভিতরের দিকে দেশের লোক কৈ তাকাচ্ছে—যত কুসংস্কার, মিথ্যাচার, বিচারহীন-প্রথার দাসত্বে লোকে যেমন ছিল তেমনিই আছে, এবং সেটা অবাধে বেড়েই চলছে—অথচ এই সব কথা বললে লাভের মধ্যে লোকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়। দেশকে ভালবাসি বলেই যত কথা বলতে চাই, যেখানটা অশান্তির মূল নিহিত বলে মনে হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু লোকে ভাবে সভায় সমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে আমাদের দেশের যা-কিছু আছে তার সমর্থন করে, এই কলিকালের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে হাহুতাশ করে দীর্ঘ বক্তৃতা না দিলে কোন কাজই হল না। হয় তাই করতে হবে, নাহয় উত্তেজিতভাবে শ্বেতাঙ্গদের মার, ঘরবাড়ী লুট কর, এই বলে চেঁচাতে হবে।

— মহাত্মা গান্ধিকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর নন্-কো-

অপারেশনের সব জিনিস আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তিনি আমাদের সকলকে ইস্কুল কলেজ ছাড়তে বলছেন এবং পরের-দেওয়া বিদেশী বিদ্যা গ্রহণ করছি বলে আমাদের লজ্জিত বোধ করতে বলছেন; কিন্তু জানি না আমি কতদূর বুঝেছি, কলেজে পড়ে হোস্টেলে থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ হয় হঠাৎ সকলে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করলে ফল একেবারেই ভাল হবে কি না। এখন অনেকের মন যা তবু একটু বাধ্য হয়ে পড়াশোনা, স্বাধীন চিন্তার দিকে যাচ্ছে, তখন সেটুকুও হবে না; কেবল সবাই যা-খুশী করে বেড়াবে, আর দেশসুদ্ধ অন্তহীন অশান্তির সৃষ্টি হবে। ভাঙ্গা সহজ, গড়ে তুলতে হলে শক্তি চাই! সেটা আমাদের কোথায়? দেশসুদ্ধ যদি national school, national college হয়, এবং তাতে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সে ত আনন্দেরই কথা; কে আর তাহলে সেদিকে না গিয়ে পারবে? কিন্তু একা মহাত্মাগান্ধীই এ কথা বলছেন, দেশবাসী সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। আমি দেখছিলাম এতে আরো একটা কুফল হয়েছে, অনেক কষ্টে যে সব কৃষকদের, গরীব গ্রামবাসীদের, তাদের স্বাভাবিক অনিচ্ছা স্বত্বেও, নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পাঠশালায় ইস্কুলে শিক্ষার জন্য পাঠাতে রাজি করা গিয়েছিল, এই আন্দোলনের ফলে তারা আর কারুকে সহজে পাঠায় না। এদিকে দু'চারটে night school পাঠশালা বন্ধ হতে চলেছে। এর ফল যে ভাল হবে, কি করে তাই বলি?

আসল কথা, এইবার আমাদের দেশের একটা দিক্‌পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে—একটা কিছু হবেই, এরকম ভাবে বেশিদিন চলতেই পারে না। অত্যাচার অশান্তি দারিদ্র্য চারিদিকে জেগে উঠেছে—

হয় চিরকালের মত হার স্বীকার করে এই অবস্থাকে বরণ করে নিতে হবে এবং এককালে জাতিকে জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, নয় স্বাধীনতার দিকে মুক্তির দিকে আত্মউপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সেদিন একটা ঘটনায় আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা হল। শহর ছাড়িয়ে আমি অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফিরতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার, শীতের রাত্রি। তার উপর ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে একা পথ চিনে চিনে আসছি, হঠাৎ মনে হল আমার পাশেই অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা ছায়ার মত জিনিস এগিয়ে চলছে। ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। কাছে গিয়ে দেখি সাত কি আট বছরের খুব কালো কঙ্কালসার একটি ছেলে। অত রোগা যে মানুষ হতে পারে আমি জানতাম না,—একেবারে অস্থিচর্ম্মসার, দুটো কাঠির মত পা, চোখ দুটো অর্থহীন ভাবে কোনোরকমে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। এই শীতের রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাতাসে তার সমস্ত গায়ে কোন আবরণ নেই, পা খালি। প্রথমে মনেই হচ্ছিল না এ কোন পৃথিবীর প্রাণী হতে পারে, এর সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকা সম্ভব। পরে জিজ্ঞাসা করতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানাল যে, এই কলেরায় (এখানে এবার এক একটা গ্রামে ভয়ানক কলেরা হয়েছে) তার সকলে মারা গিয়েছে, কেউ নেই, সে সারাটা দিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখন এমনি চলে যাচ্ছে। ঐ অন্ধকারে অমনিই সে চলে যাচ্ছিল, কোনো বিশেষ জায়গায় নয়, কারণ তার ত কোনো বিশেষ জায়গা ছিল না যেখানে সে যাবে।

এই রাত্রে এই অন্ধকারে গৃহহীন আশ্রয়হীন আত্মীয়স্বজনবিহীন একটি শিশু দারুণ শীতে বিবস্ত্র ভাবে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য কখনও ভুলব না। এরকম দুঃখ দেখলে সমস্ত জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে আরামে সময় কাটাব—এটা কেমন একেবারে অসম্ভবরকম বিসদৃশ বলে বোধ হল। এই দুঃখ দারিদ্র্য অপরিসীম অসহায়তা যে দেশে, সে দেশের কবে উদ্ধার হবে? কখনও হবে কি?—সে আশাও যে করতে পারি নে। এর পর আমরা কি করে সারহীন বক্তৃতা, মিথ্যা আন্দোলন নিয়ে সময় কাটাতে পারি? যে দেশভক্তি এই লক্ষ লক্ষ অসহায় মূক চিরদুঃখীদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না—তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ বেদনা, আশা নিরাশার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করা দরকার মনে করে না, তার সার্থকতা কি? বিলিতি পলিটিক্স, তার বাক্‌চাতুরী, তার বড় বড় ব্যঞ্জনাপূর্ণ diplomatic কলকৌশলাদি, ওসব বিদেশেই থাক,—এদেশে তার আমদানি করে কি হবে? আমাদের আদর্শ ভিন্ন, আমাদের জীবনযাপনপ্রণালী ভিন্ন, আমরা দাসত্বশৃঙ্খল-বদ্ধ দৈন্য-নিপীড়িত দুঃখজর্জ্জরিত জাতি—আমাদের আদর্শ হবে ত্যাগের, আত্ম-উপলব্ধির, সৌম্যের, সত্যের, সুন্দরের, মঙ্গলের; পাশ্চাত্য দেশের আত্মসুখানুধ্যায়ী স্বার্থপর হিংসাপ্রিয় সরলতা-বিবর্জ্জিত অস্বাভাবিক দেশভক্তির অনুকরণ করে আমরা কেন নিজেদের হাস্যাস্পদ করতে যাব?

সেদিনকার ঐ ছোটো ছেলেটিকে দেখে আমার মনে হল আমাদের ভারতবর্ষেরও ঐ অবস্থা—সে-ও অমনি গভীর অন্ধকারে অন্তহীন দুঃখের মধ্য দিয়ে অসহায়ভাবে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—তার দৈন্য

দীর্ণ, তার চতুর্দ্দিকে নির্দ্দয়তা অত্যাচার, তারও সুমুখের পথ কণ্টক-বন্ধুর বিপদসঙ্কুল, কে তাকে মঙ্গলময় শান্তিপূর্ণ আশার বাণী শোনাবে, চিরসূর্য্যালোকোজ্জ্বল আনন্দনিকেতনের দিকে পথ দেখিয়ে দেবে?

* * * *

সহজিয়া

—:০:—

এরা শুধু জীবনেরে করে উপহাস
প্রাণপণে নিশিদিন ; শতদিকে দাস
আপনায় করি, ভাবে মুক্তির গৌরব
হবে করতলগত ; যেই মহোৎসব
বিশ্ব জুড়ি' আছে ফুটি' যুগযুগান্তর
সহজ লীলায়, তারে করিয়া অন্তর,
মৃত্যুর পাষাণ স্তূপে দিল বক্ষ ভরি'—
তাই আজি দিকে দিকে ওঠে হা হা করি'
দীন হীন দীর্ণ প্রাণ ; সহজ সুন্দরে,
প্রাণপণে পড়ি' কত দুর্ব্বোধ্য মন্তরে,
দিল এরা নির্ব্বাসন ; প্রাণপীঠ হ'তে
নিভাইয়া জীবনের দীপ, কালস্রোতে
ক্ষুধাতুর তৃষাতুর দীন অসহায়,
মিথ্যা আনন্দের মোহে অই ভাসি' যায়।

(২)

রে শঙ্কিত ! জগতের ওরে পদানত !
অজ্ঞানেরে জ্ঞান বলি' করিলি আহত
জীবনের দেবতারে ; অমৃতের নামে
আনন্দেরে ঠেলি' দিলি আঁধারের পানে,

কঠোর শাসন করি ; প্রতি পুষ্পে তৃণে
যে সত্য সহজ হ'য়ে আছে নিশিদিনে
সুন্দরের মূর্ত্তি ধরি, সেই সহজিয়া
প্রতি পলে যে সঙ্গীত আনিছে বহিয়া
জলে স্থলে সমীরণে, প্রাণের দোলায়
যে রাগ-তরঙ্গ তোলে সহজ খেলায়,
করি' তারে অস্বীকার অমঙ্গল জ্ঞানে,
নিজেরে করিলি নত ; দুর্ব্বলের গানে
ভরি' দিলি চিত্ত মন প্রাণ আত্মা সব—
অভিশাপ তাই তোর জীবন-উৎসব।

(৩)

ওঠ ওঠ ওঠ আজি দেবতা সুন্দর !
চূর্ণ করি' মিথ্যাভরা মোহের পিঞ্জর,
রচ সৌধ হাসি গানে, আকাশের সীমা
যেথায় মিলন পাবে ; দৃপ্ত প্রাণ-বীণা
লক্ষ কোটী রচনায় গাহিয়া সঙ্গীত
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরি' দিবে আত্মার ইঙ্গিত,
সহজ লীলায়। ওরে মূঢ় আত্মভোলা !
আদিম প্রভাতে কোন্ জীবনের দোলা
বক্ষে করি' নেমেছিলি দুরন্ত পুলকে,
ধরিত্রীর প্রতি রেণু প্রাণের আলোকে

করেছিলি নন্দনের পারিজাত সম ;
সে মন্ত্র হারালি কোথা ওরে ও অক্ষম ?—
ত্রাসে লাজে আজি তোর অবনত শির,
প্রাপ্য চির অকল্যাণ শুধু ধরিত্রীর।

(৪)

হে দেবতা ! প্রাণ লয়ে কর কর খেলা,
যেথায় বসেছে ওই আনন্দের মেলা,
প্রতি পুষ্পে, প্রতি তৃণে, ধূলি-রেণুকায়
পুলক-স্পন্দন অতি সহজ ভাষায়
রচিছে সঙ্গীত—সেইখানে—সেইখানে
পাতি তব সিংহাসন, সহজিয়া-গানে
এ বিশ্বে ছড়ায়ে দাও আনন্দ তোমায় ;
উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত সপ্ত পারাবার
লয়ে তার রোষ রাগ নৃত্য হাসি গান,
সত্যেরে করুক বড় ; জীবনের দান
জয়পত্র শিরে বাঁধি' মৃত্যু-অভিশাপ
নিমেষে করুক নত ; অক্ষমতা পাপ
প্রাণের গৌরবে মানি' লজ্জা আর ভয়
মুক্তি দিক ধরিত্রীর জয় পরাজয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দুই বন্ধু

—:o:—

(Guy de Maupassant-র ফরাসী হইতে)

প্যারী শহর অবরুদ্ধ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মৃতপ্রায় ; ছাতে চড়াই পাখীর দেখা আর ঘটে ওঠে না ; ছাতের কোণা-কাণাচও অধিবাসীশূন্য। সকলের আহার, যা-ভাগ্যে জোটে তাই। এমনি অবস্থায় জানুয়ারী মাসের এক পরিষ্কার সকালে মঁস্যো মরিসোট কোটের পকেটে দু'হাত ভরে শূন্য উদরে বা'র-বুল্ভারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মঁস্যো মরিসোটের পৈতৃক ব্যবসায় ছিল ঘড়ি তৈয়ারী, আর নিজস্ব ব্যবসায় চটি তৈয়ারী। বেড়াতে বেড়াতে মরিসোট হঠাৎ থেমে গেলেন, কারণ তাঁর সামনে এসে পড়ল এক সহব্যবসায়ী, যার সঙ্গে তাঁর রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল।

বন্ধুর নাম মঁস্যো সোভাজ, আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে নদীর ধারে।

যুদ্ধ আরম্ভের আগে প্রতি রবিবারে মরিসোট সকালবেলায় হাতে এক বাঁশের ছিপ আর পিঠে এক টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, আর জাঁটইলের রেলের রাস্তা ধরে কোলোঁবুয়ে নেমে তিনি মারান্ট্ দ্বীপের নীচে উপস্থিত হতেন। তাঁর অভীষ্ট জায়গায় গিয়েই মাছধরা আরম্ভ করতেন। রাত পর্য্যন্ত এই মাছধরা চল্ত।

প্রতি রবিবারেই তাঁর সেখানে দেখা হত এক বেঁটেখাটো মোটা-সোটা ফুর্ত্তিবাজ লোকের সঙ্গে, তার নাম মঁস্যো সোভাজ। সোভাজের ছিল এক ছোট মনোহারীর দোকান, নোতর-দাম-দ্য-লরেটেতে,—আর ছিল মাছ ধরবার প্রচণ্ড বাতিক। এই দুজনে প্রায়ই একটা সারা বেলা পাশাপাশি বসে থাকতেন—হাতে ছিপ ধরে, জলের উপর পা ঝুলিয়ে।

এমনি করে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

কোন কোন দিন তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে একটিও কথা হত না, আবার কখনো কখনো দিব্য কথাবার্ত্তা চল্‌ত। কিন্তু কথা না বলেও তাঁরা পরস্পরকে চমৎকার বুঝতে পারতেন, কারণ তাঁদের দুজনেরই রুচি ও মনোভাব প্রায় একই ধরণের ছিল।

বসন্তের প্রভাতে নবযৌবনপ্রাপ্তের ন্যায় দীপ্ত সূর্য্য যখন শান্ত নদীর জলে তারি বুকের উপর দিয়ে ভেসে-বেড়ানো বাষ্পরাশির প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুল্‌ত, ও মাছধরায় উন্মত্ত দুজনের পিঠের উপর নববন্ধুত্বের আনন্দসূচক কিরণজাল ছড়িয়ে দিত, তখন মরিসোট হয়ত পাশের লোকটিকে বলে উঠতেন, "কেমন চমৎকার, নয় কি ?"

সোভাজ উত্তর করতেন "এমনটি আর হয় না।"

ব্যস্! এই তাদের পরস্পরকে বোঝবার ও শ্রদ্ধা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

শরৎকালে দিনের শেষে রক্তবর্ণ আকাশে যখন অস্তগামী সূর্য্য নদীর জলে লাল মেঘমালার ছায়া ফেলে সমগ্র নদীবক্ষ লাল করে, দূর দিগন্তে আগুন ধরিয়ে ও দু'বন্ধুকে আগুনেরই মত জ্বলন্ত করে তুল্‌ত, এবং যখন গাছের পাণ্ডুর পাতাগুলি যেন আসন্ন শীতের ভয়ে

থর থর করে কেঁপে সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত, তখন সোভাজ একটুখানি হেসে মরিসোটের দিকে চেয়ে বলতেন, "কি দৃশ্য"! মরিসোট বিস্ময়ভরা স্বরে অথচ চোখ দুটি ভাসমান ফাৎনার উপর থেকে না উঠিয়ে উত্তর দিতেন, "বুল্‌ভারের চেয়ে ভাল, নয় কি ?"

তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পেরে সাগ্রহে করমর্দ্দন করলেন, কারণ মন তাঁদের দুজনেরই বিকল হল এই ভেবে যে, কি অবস্থায় আবার তাঁদের দেখা হল! সোভাজ একটু নিঃশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে বল্‌লেন, "কি সব ব্যাপার দেখুন।" মরিসোট আরও নিরুৎসাহ। তিনি কাৎরিয়ে বললেন, "কি সময় পড়েছে! আজ বছরের প্রথম পরিষ্কার দিন।"

বাস্তবিকই সুনীল আকাশে আলো যেন উছ্‌লে পড়ছিল।

দুজনে চিন্তাক্লিষ্ট ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে পাশাপাশি চল্‌লেন। মরিসোট বলে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ সেই মাছধরা! ভাল কথা মনে পড়েছে।"

সোভাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কবে যাওয়া যাবে ?"

তারপর দুজনে ছোট এক কাফেতে ঢুকে গিয়ে একটু করে তিতো-মেশানো মদ খেলেন। বেরিয়ে এসে ফুটপাথের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ মরিসোট থেমে বল্‌লেন, "আর এক গেলাস।" সোভাজ রাজি হয়ে বল্‌লেন, "আপনার যেমন ইচ্ছে।" দুজনে আরেক মদের দোকানে ঢুকলেন।

বেরিয়ে আসতে তাঁদের হয়ে গেল অনেক দেরী, কারণ খালি-পেটে মদ খেলে যেমন তাল হারিয়ে যেতে হয়, তাই তাঁদের হয়েছিল। বাইরের দৃশ্য চমৎকার। মৃদু হাওয়া এসে যেন তাঁদের বাতাস দিয়ে যাচ্ছিল।

ঈষৎ গরম হাওয়া লেগে সোভাজের নেশা যেন জমে উঠ্‌ল। তিনি থেমে বললেন, "যদি যাওয়া যায় সেখানে ?"

—"কোথায় ?"

—"এই মাছ ধরতে।"

—"কোথায় ?"

—"আমাদের সেই দ্বীপের কাছে। ফরাসী অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দল কোলোম্বের কাছেই থাকবে। কর্ণেল ডুমুল্যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তিনি আমাদের যাবার সঙ্কেতবাক্য বলে' দেবেন।"

মরিসোট কেঁপে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "বেশ ; এই ঠিক। চলুন আমি যাচ্ছি।"

তারপর যন্ত্রপাতি আনবার জন্য দুজনে দুদিকে গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে তাঁরা বড় রাস্তা ধরে পাশাপাশি চল্‌লেন। যেতে যেতে যে বাড়ীতে কর্ণেল থাকেন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। কর্ণেল তাঁদের প্রার্থনা শুনে হেসে অনুমতি দিলেন। তাঁরা সঙ্কেত জেনে নিয়ে ফের রাস্তা ধরে রওনা হলেন।

খানিক পরে তাঁরা অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে ছাড়িয়ে পরিত্যক্ত কোলোম্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন কতকগুলি ছোট আঙুর ক্ষেতের মধ্যে ; সেই ক্ষেতগুলি সেইন নদীর পা'ড় পর্য্যন্ত নেমে গেছে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

সামনে তার —গ্রাম মরার মত পড়ে। জাঁটইলর্‌জেমণ্ট, ও সানোয়ার উচ্চ স্থানগুলি সকলের মাথার উপর জেগে আছে। নানটেয়র পর্য্যন্ত যে মস্ত মাঠ গিয়েছে সেটি একেবারে খালি, তার চেরী গাছগুলি ফলপাতাহীন, তার গা ক্ষতবিক্ষত।

সোভাজ একটা উঁচু জায়গায় উঠে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "ওই-খানে প্রুশিয়ানরা রয়েছে।" জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভয়ানক উদ্বেগে দুই বন্ধু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

—"প্রুশিয়ানরা !" তাঁরা কখনও তাদের চোখে দেখেন নি ; কিন্তু কয়েকমাস ধরে তারা যে আছে এটা ভাল করেই অনুভব করছিলেন। পারীর চারদিক ঘিরে, ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করবার জন্য লুট করে, খুন করে, আগুন ধরিয়ে, অদৃশ্য অথচ সর্ব্বশক্তিমানভাবে তারা ছিল। তাঁদের মনে এই অজ্ঞাত ও বিজয়ী লোকগুলার উপর ঘৃণার সঙ্গে একরকম কুসংস্কারজনিত ভয় মেশান ছিল। মরিসোট আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লেন, "ওদের অবস্থা দেখবার জন্য একবার এগনো যাক।"

রঙ্গপ্রিয়তা পারী-নাগরিকের স্বভাবজ, কোন অবস্থাতেই তা দমে না। সোভাজ উত্তর করলেন, "ভাল, কিছু মাছ ভাজি তাদের দেওয়া যাবে।"

কিন্তু মাঠের মধ্যে এগিয়ে যেতে তাঁরা ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ চারদিকের নিস্তব্ধতা এমন যে তাইতেই ভয় হয়।

শেষকালে সোভাজ বল্‌লেন, "যাক, এগিয়ে চলুন, কিন্তু খুব সাবধানে।" তারপর দুজনে এক আঙুর-ক্ষেতের মধ্যে নামলেন, হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, কতকগুলা ঝোপের আড়াল রেখে, চোখ চারদিকে রেখে, কান খাড়া করে।

নদীর ধারে পৌঁছতে কেবল খানিকটা খালি জায়গা বাকি। তাঁরা দৌড়তে আরম্ভ করলেন। সেখানে পৌঁছে কতকগুলা শুক্‌নো নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন।

মরিসোট মাটিতে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন কেউ আশে-

পাশে আছে কি না। কোন শব্দই তাঁর কানে এল না। সেখানে তাঁরা একা, আর জনপ্রাণী নেই। তখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দুজনে মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন।

সুমুখে পরিত্যক্ত মারাণ্ট দ্বীপ, নদীর অপর পার থেকে তাঁদের যেন ঢেকে রাখছিল। ছোট রেস্তোরাঁ-ঘরটি বন্ধ দেখে মনে হয়, কত বছর ধরে যেন ওটা ঐরকম পড়ে আছে।

প্রথম মাছ ধরলেন সোভাজ; দ্বিতীয়টি ধরলেন মরিসোট। তারপর প্রত্যেক বারই ছিপ উঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি বিঁধে শাদা চক্‌চকে ছোট ছোট মাছ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাস্তবিক অদ্ভুত মাছধরা। তাঁরা বেশ ধীরে-সুস্থে মাছগুলি একটা শক্ত-করে-আঁটা থলের মধ্যে পুরতে লাগলেন। থলেটা তাঁদের পায়ের কাছে জলের মধ্যে ভিজ্‌ছিল। তাঁদের মন একটা মৃদুমধুর আনন্দে ভরে গেল—অনেক দিনের অভ্যস্ত একটা আমোদ থেকে জবরদস্তি বঞ্চিত থাকবার পর হঠাৎ যখন ফিরে সেই আমোদের স্বাদ পাওয়া যায়, তখন যেরকম হয় সেইরকম তাঁদের হল।

তাঁদের পিঠের উপর তখন সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে, তাঁদের কানে আর কোন শব্দই যাচ্ছে না, তাঁদের মনেও আর কোন চিন্তার উদয় হচ্ছে না; এমনি করে সমস্ত সংসারের অস্তিত্ব তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন,—কারণ তাঁরা মাছ ধরছিলেন।

হঠাৎ একটা ভারী আওয়াজ, মনে হল যেন সেটি মাটী ফুঁড়ে বেরল ও চারদিকের মাটী কাঁপিয়ে দিল। ফের কামানের শব্দ আরম্ভ হল।

মরিসোট ঘাড় ফেরালেন। নদীর পা'ড়ের উপর বাঁয়ে ভালেরিন পর্ব্বতের প্রকাণ্ড কালো ছায়া। তার কপালের উপর যেন একখানা

শাদা পাহাড়, ধোঁয়ার একখানা মেঘ যেন পর্ব্বত তার মুখ থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ার আর একটা মেঘ দুর্গের উপর থেকে যেন ছুটে বেরল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নতুন করে গর্জ্জন আরম্ভ হল।

তারপর আবার গর্জ্জন। প্রতি মুহূর্ত্তেই পর্ব্বত তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল। সেই দুধের মত শাদা ধোঁয়ার রাশ আস্তে আস্তে উপরদিকে উঠতে আরম্ভ করল, তার মাথার উপর একখানা মেঘের মত হয়ে রইল।

সোভাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, "এই ফের আরম্ভ হল।"

মরিসোট একমনে তাঁর ফাৎনার দিকে চেয়ে ছিলেন, কারণ তাতে অনবরত টান পড়ছিল। তাঁর স্বভাব ছিল শান্তিপ্রিয়। এইরকম লোকের যেমন হয়ে থাকে তেমনি হঠাৎ তাঁর রাগ হয়ে গেল, ঐসব উন্মাদ লোকগুলার উপর, যারা এমনতর করে মারামারি কাটাকাটি করে। তিনি খুঁৎ খুঁৎ করে বল্‌লেন, "এমন করে নিজের মাথায় লাঠি মারার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধির কাজ আর কি হতে পারে?"

সোভাজ বল্‌লেন "পশুর চেয়েও এ অধম।" মরিসোট একটা মাছ টেনে তুলে বল্‌লেন "আর যে পর্য্যন্ত রাজা ও রাজত্ব থাকবে, ততদিন এইরকমই চলবে।"

সোভাজ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "রিপাব্‌লিক হলেও কি যুদ্ধ করত না?"

মরিসোট বল্‌লেন, "রাজা থাকতে যুদ্ধ হত রাজ্যের বাইরে, আর রিপাব্‌লিকের আমলে যুদ্ধ হয় দেশের ভিতরে।"

তারপর তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তমনে আলোচনা করতে আরম্ভ

করলেন রাজনীতির সব বড় বড় কথা, স্থূলদর্শী ঠাণ্ডামেজাজী লোকেরা যেমন বিজ্ঞভাবে করে থাকে। কেবল একটা বিষয়ে তাঁদের মতের মিল হল—সেটি এই যে, স্বাধীনতা ভোগ করা তাঁদের কপালে নেই।

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগল;—গোলার আঘাতে ফরাসী বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দিয়ে, ফরাসী মানুষ পিষে দিয়ে, গাছ পাথর গুঁড়ো করে দিয়ে ভালেরিন গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। কত স্বপ্ন, কত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, কত সুখের আশা শেষ করে দিয়ে, কত স্ত্রীর বুকে, মেয়ের বুকে, মায়ের বুকে অসীম শোকের উৎস খুলে দিয়ে ভালেরিণ পাহাড় গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। সোভাজ বল্‌লেন, "একেই বলে জীবন।"

মরিসোট বললেন, "তার চেয়ে বরং বলুন যে একেই বলে মৃত্যু।"

তাঁদের পিছনে কে যেন এসেছে টের পেয়ে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। চোখ ফিরিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন ঘাড়ের পিছনে সোজা দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড লম্বা সশস্ত্র দাড়িওয়ালা চারজন লোক, বড় ঘরের চাকরদের মত পোষাক আর মাথায় চেপ্‌টা টুপি পরে' তাঁদের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে রয়েছে।

দু'খানি ছিপ তাঁদের হাত থেকে খসে পড়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে নদীতে নামতে লাগল।

তারপর তাঁদের পাকড়াও করে, বেঁধে এক নৌকার উপর ফেলে সামনের দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। যেটিকে তাঁরা মনে করছিলেন খালি ও পরিত্যক্ত, সেই ঘরের পিছনে তাঁরা দেখলেন রয়েছে কুড়িজন জার্ম্মাণ সৈন্য।

লোমশ দৈত্যের মত চেহারার একজন লোক এক চেয়ারের দুইধারে ঠ্যাং তুলে দিয়ে বসে প্রকাণ্ড এক পোর্‌স্‌লেনের পাইপে তামাক টানছিল। সে খুব ভাল ফরাসীতে বল্‌লে, "নমস্কার মশাই, আপনাদের বেশ ভাল মাছধরা হয়েছে ত?"

একজন সৈন্য অফিসারের পায়ের কাছে এক থলেভরা মাছ ফেলে দিল, সেটা তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করবার সময় তার বয়ে আনতে হয়েছিল। প্রুশীয় অফিসার একটু হাস্‌ল—"হি হি, তাইত দেখ্‌ছি মন্দ শীকার হয় নি। যাক্‌গে ও-কথা। এখন আমি যা বলি সেইটে মন দিয়ে শুনুন। কিছু ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমার চোখে আপনারা দু'জন গুপ্তচর, আমার উপর নজর রাখবার জন্য আপনাদিগকে পাঠানো হয়েছে। কাজেই আমার কর্ত্তব্য আপনাদিগকে ধরা, ও গুলি করে মারা। আপনারা ভাল করে কাজ হাসিল করবার জন্য মাছ ধরবার ভাণ করছিলেন। আমার হাতে আপনারা পড়েছেন, সেটা আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ বলে। এই হচ্ছে যুদ্ধের নিয়ম। কিন্তু আপনারা যখন অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল ছাড়িয়ে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের ফিরে যাবার সঙ্কেত জানা আছে। আমাকে সেইটে বলে' ফেলুন, আমি আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি।"

দুই বন্ধুর মুখ শাদা হয়ে গেল। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের হাত কাঁপুনির চোটে ঠক্ ঠক্ করে নড়ছিল। দুজনেই চুপ করে রইলেন।

অফিসার ফের বল্‌লে, "কেউ কথাটা জানবে না, আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে চলে যাবেন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সব গোলযোগ চুকে

যাবে। অমত করলে মৃত্যু, আর তারপর যা হয়ে থাকে। চট্ করে ঠিক করে ফেলুন কি করবেন।"

দু'জনেই চুপ করে রইলেন, তাঁদের মুখ সমান বন্ধ রইল।

প্রুশীয় অফিসার একটুও চটল না। নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বল্লে, "বুঝছেন না যে আর পাঁচমিনিটের মধ্যে ওই নদীগর্ভে আপনাদের ঠাঁই হবে? পাঁচ মিনিট!—আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বোধহয় কেউ নেই?"

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল।

দুই বন্ধু সোজা দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলেন। জার্ম্মাণ অফিসার নিজের ভাষায় কি হুকুম দিল। তারপর বন্দীদের কাছ থেকে নিজের চেয়ার সরিয়ে নিল। তারপর বারোজন লোক বিশ হাত দূরে বন্দুক খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল।

অফিসার বল্‌লে, "আমি আপনাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি, আর দু'সেকেণ্ডও বেশি নয়।"

তারপর হঠাৎ সে উঠে ফরাসী দুজনের কাছে এগিয়ে গেল। মরিসোটের হাত ধরে তাঁকে টেনে দূরে নিয়ে গিয়ে নীচুগলায় বল্‌লে, "চট্ করে বলে ফেলুন আপনার সঙ্কেত কথাটি কি? আপনার সঙ্গী জানতে পারবেন না। আমি যেন দয়া করছি এই ভাব দেখাব।"

মরিসোট কোনই উত্তর করলেন না।

অফিসার তারপর সোভাজকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ কথাই বল্‌লে।

সোভাজও কোন উত্তর দিলেন না।

দু'জনকে আবার পাশাপাশি দাঁড় করান হল। অফিসার হুকুম দিল, সৈন্যেরা বন্দুক তুল্‌লে।

তখন মরিসোটের হঠাৎ চোখে পড়ল কিছু দূরে ঘাসের মধ্যে মাছের থলের উপর। একটুখানি সূর্য্যের কিরণ সেই মাছগুলির উপর পড়ে চক্‌চক করছিল। মাছগুলা তখনও নড়ছিল। মরিসোটের মূর্চ্ছার মত হল। অনেক চেষ্টা করেও তিনি থামাতে পারলেন না। চোখ জলে ভরে এল।

তিনি তোৎলার মত বল্‌লেন, "বিদায় মঁস্যো সোভাজ!"

সোভাজ উত্তর করলেন, "বিদায় মঁস্যো মরিসোট।"

তাঁরা দু'জনে হস্তমর্দ্দন করলেন। তখন তাঁদের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভয়ানক কাঁপ্‌ছিল।

অফিসার বল্‌লে, "গুলি চালাও।"

বারোটা বন্দুকে একসঙ্গে দম্ করে আওয়াজ হল।

সোভাজ ধপ্‌করে নাক-থুবড়ে পড়লেন। মরিসোট ছিলেন লম্বা। তিনি হেলে ঘুরে মুখ আকাশের দিকে করে তাঁর সঙ্গীর উপর ঢলে পড়লেন। বুকের উপরকার সার্ট ফেটে ঠেলে উঠতে লাগ্‌ল তাঁর রক্ত।

জার্ম্মাণ সৈনিক এবার নূতন আদেশ দিল।

কয়েকজন লোক সেখান থেকে চলে গেল। ফিরে এল তারা খানিক দড়ি আর একরাশ পাথর নিয়ে। সেগুলা ঐ মৃত দু'ব্যক্তির পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর তাঁদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল নদীর ধারে।

ভালেরিণ পাহাড় তখনও অবিরাম গর্জ্জন করছিল। মাথার উপর তার ধোঁয়ার আর এক বিরাট পাহাড়।

দু'জন সৈন্য মরিসোটকে পা ও মাথা ধরে তুলল, আর দুজন

সোভাজকেও অমনি করে ওঠাল। দুটা মৃতদেহকে এক ঝাঁকুনিতে উপরে উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। সে দুটি একবার পাক খেয়ে সিধা হয়ে জলে পড়ল, কারণ সবার আগে পায়ের উপর পাথরের ভারে টান পড়েছিল।

জল ছিটিয়ে ভুরভুরি কেটে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ছোট ছোট ঢেউগুলি সরতে সরতে কিনারা পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। জলের উপর ভেসে রইল কেবল এক ফোঁটা রক্ত।

অফিসারের মেজাজ একটুও গরম হয় নি। সে স্বগত বল্‌লে—"এইবার মাছগুলার পালা।"

তারপর সে ঘরের দিকে ফির্‌ল।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঘাসের মধ্যে পড়ে সেই মাছের থলের উপর। সে সেটা হাতে করে তুল্‌লে, নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লে, তারপর খানিক হেসে ডাক দিলে—

—"উইলিয়াম!"

একজন শাদা পোষাক পরা সৈন্য তার কাছে দৌড়ে গেল। তখন সেই প্রুশিয়ান গুলি-করে-মারা ফরাসী দু'জনার ধরা মাছ তার কাছে ফেলে দিয়ে হুকুম করলে—

—"ওই ক্ষুদে মাছগুলা তাজা থাকতে থাকতে আমার জন্য ভেজে দাও। খেতে ভারি চমৎকার হবে!"

তারপর সে ফের পাইপ টানতে লাগ্‌ল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

"ডেস্ট্রাক্‌টিব্"-এর ওজর

এই একটা কথা নিত্য শুন্‌তে পাওয়া যায়, যে "সবাই কেবল সমালোচনাই করছেন, ভাঙছেনই। কই কে কি গড়ে তুলছেন, Constructive কেউ কিছু লিখছেন না ত।" নব্য দলের বিরুদ্ধে এটা যে একটা নতুন কিংবা একমাত্র অভিযোগ তা নয়। কিন্তু এ সমস্ত বাণবৃষ্টিতে রুষ্ট হবার চাইতে হৃষ্ট হবার কারণই বেশি। নিত্য-নিয়ত পরের কণ্ঠের জয়রব শোনবার জন্যে যে উৎকণ্ঠা, সেটা সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নয়। আর, কবি যাই বলুন, নবীন প্রাণকে কেউ কোনোকালে শঙ্খধ্বনি করে বরণ করে নি। কেবল উদ্‌ভিদই যে মাটী ফুঁড়ে বেরয় তা নয়, জীবনের জন্মই হয় ভেদ করে' ব্যথা দিয়ে। বাণ যে এসে পড়চে, তাই হচ্ছে প্রমাণ যে অঙ্কুর বেরিয়েচে—কেননা শূন্যের গায়ে লক্ষ্য-বেধ করা চলে না।

নবীন, জন্ম নিয়েই কোথায় সে জন্মেছে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখচে। কেননা, সে বল্‌চে, এই যে দু'টি নয়ন এ বন্ধ রাখবার জন্যে তৈরি হয় নি, একে রাখতে হবে সম্যক্ বিস্ফারিত করে'। দূর থেকে দেখলে একটা জিনিসকে সুন্দর দেখায়; নৈকট্যই সৌন্দর্য্যের বিনাশক—সেই জন্যেই ত আমাদের দেশকে সুন্দর দেখ্‌তেই হবে বলে' যাঁরা ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করে' বসেছেন—তাঁরা করেন কি, না, আমাদের দেশটিকে একেবারে মূলসুদ্ধ উপ্‌ড়ে তুলে ভীষ্মেরও পিতামহ যে

মান্ধাতা, তাঁরই আমলের কোনো কৈলাস বা সুমেরুর এক শৃঙ্গের উপরে চড়িয়ে রেখে দেন—যাতে নীচে থেকে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারেন মনের সাধে, "বাঃ"। এর মধ্যে যে কোনোই সত্য নেই তা নয়, সমগ্রই হচ্চে সুন্দর, আর সমগ্রকে একেবারে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাওয়া যায়ই না। কিন্তু সমগ্রকে দেখাই যে সম্যগ্‌দৃষ্টি, তা সব সময়ে সত্য নয়। সমগ্রের মধ্যে ত কোনো খুঁত নেই, অথচ প্রথম সম্যগ্‌দ্রষ্টা যে শাক্যসিংহ, জীবনের খুঁতগুলি তাঁরই চোখে যেমন পড়েছিল এমন ত আর কারু নয়। সমগ্রের অবলোকন, সমালোচন নয়, তা কাব্য; আর সমালোচক কবি নন্,—বৈজ্ঞানিক; খণ্ড খণ্ড করাই তাঁর কাজ—আর তা করতে গেলে সমগ্র যদি প্রাণ হারান, তবেই দেশসুদ্ধ লোকের প্রাণ আঁৎকে উঠে, বলে "Destructive"!

(২)

সত্যকে জান্‌বার পথে যে কতকগুলি বাধার নাম হার্বার্ট স্পেন্‌সার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটা নাকি ভাবোচ্ছ্বাস। ভক্তি-অশ্রুর কুয়াসার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটাকে দেখচি, তা রং-বেরং হ'তে পারে; এমন কি অতীতের জন্য শোকাবেগ প্রবল হয়ে উঠ্‌লে তা "রোদনের রঙে রাঙ্‌"ও দেখাতে পারে; কিন্তু বস্তুকে যে ঝাপ্‌সা করে' দেখব সে সম্বন্ধে ত কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। অথচ এ যুগে সাহিত্যে ঝাপ্‌সার জায়গা থাক্‌লেও বস্তুজগতে ও-পদার্থের ঠাঁই নেই। সমস্ত জাতিদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান, সে ত অতি দেদীপ্যমান—কোথাও ত এতটুকু ভুল করবার জো নেই। ফিজি, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আমেরিকা—এ সমস্ত জায়গায় ভারতবর্ষের কি

অবস্থা তা কেবল তাঁদেরই অজানা যাঁরা জেগে ঝিমোন্। এই দিবা-লোকের মধ্যে আমাদের নাড়া দিয়ে সজাগ করছেন যাঁরা তাঁরাই আমাদের বেশি আত্মীয়, যাঁরা ঘুম-পাড়ানো মাসিপিসির গানে আমাদের ঘুম পাড়াবেন তাঁদের চাইতে। নির্ম্মম হস্তে যাঁরা আমাদের প্রিয় ধারণাগুলিকে ধূলিসাৎ করবেন, তাঁদের আমাদের ভাল না লাগ্‌তেও পারে, কিন্তু যতই আমরা চট্‌ছি ততই প্রমাণিত করচি যে, আমাদের মধ্যে তাঁদের ঔষধের ক্রিয়া সুরু হয়েচে।

(৩)

অথচ, আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাঁরা Destructive-দের সমালোচক, তাঁরা নিজেরাও, কি জীবনে কি সাহিত্যে, Construction-এর কোনোই পরিচয় দেন নি। তাঁরা গীতার শ্লোক আউড়ে আদালতে চলে যান মোকদ্দমা করতে, আর তাঁদের যত-কিছু জাতীয়তা সে কেবল মাসিক পত্রের ছত্রে ছত্রে। সমস্ত বৃন্দাবনী-উচ্ছ্বাসের মধ্যে "জন্মান্তর"-এর মত একটি কবিতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে কলম থেকে "হিং টিং ছট্" বেরল, সেই কলম থেকেই বেরল এমন শত-শত গান আর কবিতা, যার মধ্যে অতীত ভারতবর্ষের প্রতি এমন এক গভীর শ্রদ্ধার সুর বাজছে, যার দোসর নেই। "এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা" আর "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে" একই ব্যক্তির লেখা।

আসল কথা, যে-মনের ভিতরে একটা বড় আদর্শ ফুটে উঠেচে, সে-ই বাস্তবের হীনতা দেখতে পায়,—ইতরের সে সাধ্য নেই। যে গড়্‌তে পারে, কেবল তারই ভাঙ্‌বার ক্ষমতা আছে—অন্যের অরণ্য

কুড়ুল মারতে কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু সে কেবল ঠক্‌ঠকানিতেই পর্য্যবসিত। রুশো এবং ভলটেয়ার—যাঁদের চিদাকাশে ভবিষ্যৎ সভ্যতার চেহারা ফুটে উঠেছিল, তাঁরাই বর্ত্তমান-ফ্রান্সকে বলের সঙ্গে ঘা দিতে পেরেছেন। ভারতবর্ষের শুভ্র নিরুপম নিষ্কলঙ্ক গরীয়সী মূর্ত্তিকে কেবল ধ্যানে দেখা নয়, জীবনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েচে, তাঁরা বাস্তব ভারতবর্ষের পঙ্গুতা ও ত্রুটি দেখে বেদনায় কেঁদে ও হেসে ওঠেন। সেই মূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রলাল দেখে ছিলেন বলে তীব্র হাসি হাসতে পেরেছিলেন। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভারত-বর্ষকে যাঁরা প্রণিপাত করেছেন, তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। খোসামুদি আর শ্রদ্ধা অবশ্য এক নয়। আদর্শকে নমস্কার করা হচ্ছে নিজেকে সবচাইতে উচ্চ করা—যত-টুকু উচ্চতার সম্ভাবনা প্রকৃতির মধ্যে রয়েচে। এবং আদর্শের আলোকেই জ্বল-জ্বল করে ওঠে যত-কিছু দৈন্য এবং যত-কিছু কালী। যাঁরা সেই দৈন্যকে দেখতে পান নি, আদর্শ তাঁদের কাছে স্ফুট নয়। শুয়ে অবশ্য দাঁড়ানর কল্পনা করা কঠিন নয়, কিন্তু দাঁড়াতে গেলে দেখতে পাওয়া যেত "জড়ায়ে আছে বাধা" এবং সেই বাধা বাইরের নয়, আপনারই মধ্যে।

(৪)

আসল কথা, আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েচে একটা স্থাবরতা, স্থবিরতা যার ছোট বোন। নবীন প্রাণের সঙ্গেও তার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা নয়, এবং সম্পর্কটা নেহাৎ পাতানোও নয়, একেবারে "যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ"। তবে অহি-নকুলের মত সম্পর্কটা সর্ব্বদা প্রকাশ্য নয় ; এবং যতই অপ্রকাশ ততই বেশি ভয়াবহ।

পাকা-বুদ্ধির সঙ্গে নবীন প্রাণের তফাৎই এই যে, এর একটি দিবারাত্র হিসাব করে চলেন তাই ভুল করেন না, আর একটি দিবারাত্র হিসাব করে না তাই ভুল করে। মিথ্যার সঙ্গে ভুলের তফাৎ এই যে, ভুল হচ্চে সত্যের পথে যেতে পদস্খলন, আর মিথ্যা হচ্চে সত্যের দিকে পিছু ফিরিয়ে একেবারে সীধা উল্‌টো দিকে যাত্রা। ভুল যে করচে, তবু সে এগিয়েই যাচ্চে তার গন্তব্যের পথে। মিথ্যা দিয়ে যে নিজেকে আবৃত করচে, সে নিজেকে বিনাশ করচে—নিজেকে বাঁচাবার সুবুদ্ধি খাটাতে গিয়ে।

যে-কোনো নর-সমাজের মধ্যে যা-কিছু আছে সবই ভাল, কিছুই ছাড়াবার নেই, একথা বললে এই মিথ্যা কথাটি বলা হয় যে, "মানুষ পূর্ণ"। মানুষের যা অপূর্ণতা, তা হচ্চে ভ্রান্তি, এ সব কথা অদ্বৈত-বাদীর মুখে যতই সাজুক আমরা যারা কোনো বাদী নই, আমরা ও-সমস্ত হাওয়ার দুর্গে বাসা বাঁধতে মোটেই রাজি নই। চোখের সামনে যা দেখচি তাকে ভেল্‌কি বলে উড়িয়ে দিতে মস্তিষ্কের যে অবস্থাটায় পৌঁচা দরকার, দর্শনের ব্যোম-যানে চড়ি নি বলেই হোক্, কি যে কারণেই হোক্, আমরা আজও সেখানে পৌঁচতে পারি নি।

বস্তু যখন চিৎ-এর উপরে ওঠে, বাইর তখন ভিতরকে ছাপায়। মোটা মানুষ যখন বেদম খেয়ে আসন থেকে আর উঠতে পারে না, জোর হাওয়ায় ছাতাটাকে হাত থেকে ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলে মানুষ যখন তার পেছনে দৌড়ায়, জড়ের কাছে তখন হয় মনের পরাজয়। Form যখনই Spirit-কে ছাড়িয়ে গেছে তখনই যুগেযুগে মানুষের শিল্পে সাহিত্যে সে হাস্যরস জুগিয়েছে। ডেষ্ট্রাক্‌টিবিষ্ট্ কি হাস্যরসিক? তার হাসি অন্তত "Crackling of thorns" নয়।

তার হাসি বলবান্ প্রাণের সবল বক্ষ বিস্ফারী বিপুল "হা হা"—যেমন হাসি ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের প্রবক্তার।

রবীন্দ্রনাথের "তোতা-কাহিনী"র হাস্য কি বাঙলা সাপ্তাহিকের বা দৈনিকের শ্লেষের বক্রহাস্য? সকল জাতীয় প্লেথোরিক্ অতিকায়তার অন্তঃসারহীন বৃদ্ধিকে যিনি কেবল সাহিত্যে নয়—জীবনের মধ্যে আক্রমণ করেছেন—সমস্ত উপকরণ জঞ্জাল-মুক্ত সরল একটি তপোবন-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোকে যিনি সত্যসত্যই—কবির মানস-লোকে নয়, একেবারে বাস্তবিকতার মধ্যে "Construct" করলেন, পাশকরা ইনস্পেক্টর ও ভাতে-মরা গুরুকুলের কেতাবখানাকে বিদ্রূপের ব্যঙ্গোক্তি না করলে যে তাঁর সময় কাটত না, তা নয়। শিক্ষা বাড়চে, না, জীবনের বিপুল অপচয় হচ্চে, তারি বেদনা কাঁপিয়েচে সেই চিত্তকে যে চিত্ত সমস্ত দেশের মর্ম্মলোকের গুহাকন্দরের অধি-বাসী—সেই ব্যথা গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসচে অট্টহাস্য হয়ে।

(৫)

প্রকৃতি তরুণ তরুকে কাঁটা দিয়েছেন—উদ্‌ভিদ্‌ভোজী জন্তুদের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে। নবীন প্রাণকে তেমনি দিয়েছেন চোখা এপিগ্রাম্। সাধুভাষার সোথ যদি বিঁধে যায় ফুঁড়ে যায়, ত বদ্‌রস বেরিয়ে গিয়ে সুস্থতার শীর্ণতা আসবে। শীর্ণতাই সৌন্দর্য্য, কেননা আত্মা সেখানে বাহুল্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে কোমল করপদ-পল্লবে ক্ষীণ ওষ্ঠপুটে ছন্দ-প্রাপ্ত।

শ্রীমণিগুপ্ত

ভুল

—:০:—

সে থাকত নিজের খেয়ালে। মাঠে ঘাটে সে ঘুরে বেড়াত—ঝোপে ঝাড়ে সে পড়ে থাকত। বৃষ্টিতে ভিজতে ছিল তার আনন্দ—রোদে পুড়তেও তার আপত্তি দেখা যেত না। কত রাত সে পথে পথে ফিরেচে, কত দিন সে বনে বনে ঘুরেচে। এজন্য সে কত বকুনি খেয়েচে কত অনুতাপও করেচে কিন্তু এ না করেও সে থাকতে পারে নি।

সমবয়সীদের হাসি খেলার মধ্যেও সে থাকত। তাকে না হলেও তাদের খেলা জমত না, হাসি মজত না। এদের সঙ্গে তার ঝগড়াও হত কিন্তু হাতাহাতি হবার আগেই সে হেসে ফেলত। সকলে বলত তার একটু ছিট আছে। শুনে সে এমন কৌতুক অনুভব করত যেন তেমন মজার কথা সে কখনো শোনে নি।

ছোটদের সঙ্গেও তার বেশ বনত। তাকে পেয়ে তারাও খুশী হত এবং তাদের নিয়েও সে থাকত ভাল।

পাড়ার লোকের কাজ সে করে দিত কিন্তু বাড়ীর কোন কাজে মা তাকে খুঁজে পেতেন না। সেই দুঃখে তিনি কাঁদতেন, মাথা খুঁড়তেন—সেও ভাত না খেয়ে বাড়ী না এসে তার শোধ তুলত। রাত্রে তার কথা শুনে মা কতবার ভেবেছেন এমন ছেলে আর হবে না—দিনেও তিনি তাই বুঝেছেন কিন্তু সে চোখের জলে।

দেখেশুনে বড়রা তাকে জমায় বাদ দিয়ে রেখে ছিলেন—সে তাতে বরং সুখীই হয়েছিল। এক দিন বিকেলবেলা একটা বকুল তলায় সে বসে ছিল। তখন বোশেখ মাসের শেষ—ফোঁটা ফুলগুলি নীরবে ঝড়ে পড়ছিল গাছথেকে, দেখে মনে হল যেন তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

কি মনে হল, আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবচে সে সেখানে বসে। উত্তরে সে যা বললে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না; কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে সে স্বীকার করলে কথাটা আমায় সমজে দেবে এক দিন।

কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখে যখন কথাটা মনে পড়ল তখন উল্টো চাপ দিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার কথা সে ভুলে গিয়েচে কি না।

উত্তরে সে শুধু একবার আমার দিকে চাইল, কোন কথা বলল না; কিন্তু বোধ হল আমার কথায় সে মনে লজ্জা পেয়েচে।

তারপর এক দিন শুনলাম সে হঠাৎ মারা গিয়ে গিয়েচে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাগল বটে কিন্তু লোকটা ছিল মন্দ নয়।

শেষে এক দিন তার ভাই আমার হাতে একখান চিঠি দিয়ে গেল। পড়ে দেখলাম তার চিঠি। সে লিখেচে—

"কথা দিয়ে তোমার সঙ্গে তা রাখি নি বলে তুমি রাগ করেছিলে। আমার কথার যে অত দাম আছে তা আমি ভাবি নি, তবু তুমি যখন তা ভেবেচ তখন সে কথার মর্য্যাদা আমায় রাখতেই হবে। কিন্তু মুখে বলবার সময় হবে না বোধ হয়, তাই এই লিখে জানাচ্চি কি ভাবছিলাম সে দিন।

কারণ আমি আর বাঁচব না। কিছু দিন থেকেই কথাটা বুঝেচি কিন্তু আগের রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত তার ব্যথাটাও যেন অনুভব করচি।

স্বপ্নে দেখলাম যেন, সমস্ত রাত ধরে ফুল ফুটচে, বনের বুকের মধ্যে পাতার আড়ালে। কেউ তা টের পাচ্চে না, কারণ যদিও তার গন্ধ আছে তা ছড়াবার বাতাস নেই এবং তার রূপ আছে বটে কিন্তু তা দেখাবার আলো নেই।

ভোর হতে না হতে কিন্তু বাতাস তার ঠিকানা বলে দিল, আলো তারে পাকড়াও করে ফেলল। ধরা পড়লে দেখা গেল, তখনো তার পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে রাতের শিশির টল টল করচে আর ভোরের আলো তার মধ্যে ঠিকরে পড়চে।

দেখতে দেখতে রোদে তার দলগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। বোঝা গেল ঝরে পড়ারও বেশি দেরী নেই আর।

শেষে সে ঝরেও পড়ল।

আকাশ ব্যাপে রইল তার প্রীতি, বাতাসে লেগে থাকল তার গীতি আর মানুষের মনে চেপে বসল তার স্মৃতি। সে স্মৃতি আবার তার নিজের নয়, যতটা অশ্রুবিন্দুর মত সেই এক বিন্দু শিশিরের আর তার মধ্যে প্রভাত অরুণের যে আলো চিকচিক করছিল, হাসির মত সেই আলোর।

ব্যথাভরা প্রাণ নিয়ে মানুষ ভাবল ফুলের আদর সেই জানে তার কদরও তাই তার কাছে।

লজ্জায় গোধুলি আকাশ লাল হয়ে গেল—মলয় বাতাস ক্ষণে ক্ষণে মরমে শিউরে উঠতে লাগল।

ঘুম ভেঙে গেল।

কাল শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল মরণটা যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েচে আর মরণাহত মনে কেমন করে হল জানি নে, কিন্তু মনে হতে লাগল যে মরে গেলে আমার কথা তুমিও ভুলতে পারবে না এবং তোমার সঙ্গে যে কথা রেখেচি সেই কথাই সকলের বেশিকরে মনে পড়বে তোমার। কিন্তু তুমি বুঝবে না যে এ কথা আমি রাখি নি, তুমি রাখিয়েচ। তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু তবু দুঃখ হয় যে, এই পরিচয়ই আমার স্বরূপ বলে তুমি বার বার ভুল করবে।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

উড়ো-চিঠি

—:০:—

জানুয়ারী ১, ১৯২১

জীবনকুমার

পুরোনো "প্রবাসী"র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা প্রবন্ধে তুমি এই কথাগুলো পেয়েছ—

"আজ আমরা দেশকে তুল্‌তে যাচ্ছি, নেশান গঠন করতে যাচ্ছি, যশহীন গৌরবহীন ঐশ্বর্য্যহীন এই হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি; কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে' তুলতে চাইলে আগে সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুলতে হবে। আর সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করে' তার অন্তরে এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রেমকে জাগ্রত করে' তুল্‌তে হবে।"

এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, ঐ কথাগুলোয় আমি কি বুঝি? অর্থাৎ—তোমার ঐ প্রশ্নযুক্ত বাক্যের পরিষ্কার ভাব হচ্ছে, "ওর একটা বিশদ ও সরল ব্যাখ্যা করহ।"

তুমি যে প্রবন্ধটি থেকে ঐ লাইন ক'টি উদ্ধৃত করেছ সে প্রবন্ধটি যে-সময়টাতে "প্রবাসী"তে বেরয় সে-সময়টা আমার বেশ মনে আছে। কেননা ঐ প্রবন্ধটি বেরবার পরই বাঙলা-সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক হঠাৎ কি-রকম যেন-এক-রকম ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই ক্ষিপ্ত অবস্থার প্রধান লক্ষণ ছিল তাঁদের নিজ নিজ

হাতের কলমকে সত্যিকার সঙ্গীন বলে' ভুল করা। যে-অবস্থায় তাঁদের হাতের সেই সঙ্গীনটাকে, দু'চোখ বুঁজে এম্‌নি করে' তাঁরা চালিয়েছিলেন যেন তাঁরা ওয়াটার্লু যুদ্ধে Duke of Wellington-এর Tommies. সেই কস্‌রতে তাঁদের হাতের কলমরূপী সঙ্গীনের ডগা থেকে অজস্র মসি-কণা যে তাঁদের দু'গালে এসে উড়ে পড়েছিল তা তাঁদের চোখেই পড়ে নি। কেননা সেই ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাঁদের মনের দর্পণে নিজের নিজের মুখ দেখবার কথা একবারও মনে ওঠে নি।

সে যাই হোক্, এতে করে' একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন কোন বাঙালীর মনে এমন একটা জিনিসের এম্‌নি ভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে, সেটাকে একটা রিপু বলা চলে। সে-জিনিসটির নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে দ্বিতীয় রিপুটি সহজেই আবির্ভূত হন।

কিন্তু যাক সে কথা, তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ তখন ঐ লাইন ক'টির একটা ব্যাখ্যা তোমায় দিচ্ছি—আমি যেমন বুঝি। সে ব্যাখ্যাটা সরল হবে কি না তা বল্‌তে পারি নে, তবে সেটা বিশদ করবার দিকে একটা বিশেষ চেষ্টা আমার থাক্‌বে।

(২)

দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আমার মনে বড় লেগে আছে। সে-কথাটা হচ্ছে "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" এই কথাটা আমি খুব মানি, তবে ওর দু'টি পদ ছাড়া—ঐ যে ঐ "মহৎ কাজ"। ঐখানেই স্বামী বিবেকানন্দ exclusive হয়েছেন।

আসলে মহৎ-ই হোক ও অসৎ-ই হোক, কোন কাজটাই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কেননা মহৎ কাজ ও অসৎ কাজ এ-দু'টোতে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ নেই, অর্থাৎ—দু'টোই একই শ্রেনীর, অর্থাৎ—মহৎ কাজও যেমন অসাধারণ, অসৎ কাজও তেমনি সাধারণ নয়। ওর দু'টোর গায়েই সংসারের সেই সহজ জিনিসটির ছাপ নেই, যে জিনিসটির নাম হচ্ছে mediocrity, আসলে ও-দুটো হচ্ছে যমজ ভাই। এবং ও-দুটোর যে দু'রকম নাম দিয়ে রেখেছি তা কেবল ওদের চিনে নেবার সুবিধার জন্যে। কারণ আমাদের মতলব এই যে আমরা ওর একটার স্তবস্তুতি করব আর একটাকে গালাগালি দেব।

মহৎ অসৎ বা সৎ অসৎ-এর গা থেকে সুনীতি দুর্নীতি, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদি যত রকমের সভ্য-পোষাক আছে সব খুলে নিয়ে যদি সাদা চোখে স্পষ্ট দেখ্‌তে চেষ্টা কর তবে দেখবে যে, ওর পিছনে রয়েছে মানুষের আদিম মন, অর্থাৎ—primitive mind. অর্থাৎ—তার লাভ লোকসানের হিসেব, একেবারে সোজা আর ছাঁকা। বাড়ীতে ডাকাত পড়ে' যদি ডাকাতি করে' যায় তখন সেটা যে অত্যন্ত অসৎ কাজ, সেটা যে-কোন দেশের পিনাল কোড্ খুললেই দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু "একদা যখন বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়," তখন সেটা যে খুবই মহৎ কাজ হয়েছিল এটা যে কোন স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত বাঙালীর কাছ থেকে শুন্‌তে পাবে। তবে লঙ্কা-বাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয়ই তেমন মহৎ বলে' প্রতীয়মান হয় নি। যদি বা হ'য়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তাতে তাদের একটা বড় রকমের লাভ হয়েছিল জান্‌বে। জার্ম্মান ইম্পিরিয়েলিজম্ যে কতদূর অসৎ, তা ত আমরা সবাই জানি; কিন্তু ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের মহত্ত্ব

কতদূর তা ত আমাদের সবার কাছেই মান্য। তবেই দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, মহৎ বা অসৎ, এ দুয়ের পিছনে রয়েছে একটা ব্যক্তিগত বা জাতিগত লাভালাভের হিসেব। এবং ঐ কারণেই একই প্রকৃতির কাজ সামাজিক হলে অসৎ হ'য়ে পড়ে, কিন্তু আন্তর্জাতিক হ'লেই মহৎ হ'য়ে ওঠে। কেননা আমাদের মন স্ব স্ব জাতির বাইরে গিয়ে দু' তিনটি জাতিকে সমষ্টি হিসেবে দেখ্‌তে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া নিতান্তই ঝগড়া; কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে শৌর্য্য। সুতরাং বুঝ্‌তে পাচ্ছ যে, "মহৎ" ও "অসৎ-এ"যে তফাৎ সেটা বস্তুগত বা বিষয়গত নয়, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত। অর্থাৎ—সেটা objective ততটা নয় যতটা subjective. আমার কথাগুলো তোমার কাছে স্পষ্ট হ'ল কি না তা জানি নে। কিন্তু না হোক্ ও-দুটোকে আর একটা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক্।

তুমি জান, গেলযুদ্ধে জার্ম্মানদের সঙ্গীনের খোঁচা ইয়োরোপ আমেরিকার অনেক অনেক ফিলজফারদের মাথার খুলিটা একটু একটু ফাঁক করে দিয়েছে, সেই অবস্থায় তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় হাওয়া লাগ্‌তেই তাঁরা জার্ম্মানদের সম্বন্ধে ভাবতে লেগে গেছেন। Harvard University-র প্রফেসর একটি Spanish ফিলজফারের একখানা বইয়ের দু'এক অধ্যায় সেদিন দেখেছিলুম। তাতে তিনি শোপেনাহার ও নিট্‌শে, এ দু'জনের তুলনা করেছেন! তাতে তিনি বলেছেন, শোপেনহার ছিলেন Pessimist, আর নিট্‌শ্-এ ছিলেন Optimist; তাতেই বোঝা যায় যে ও দুটি মানুষের ধাতু ছিল একই। Pessimism যেটা founded on reflection, সেইটেই Optimism, founded on courage হ'য়ে

দাঁড়ায়। অর্থাৎ—একজনকে উল্টিয়ে দেখ্‌লেই আর একজনকে পাওয়া যায়। কেন না, the belief in a romantic chaos lends itself to pessimism, but it also lends itself to absolute self-assertion. এটাও ঐ Spanish ফিলজফারের কথা। মানুষ মর্‌তে মর্‌তেই মরিয়া হ'য়ে ওঠে, এ-ত জানা কথা। চরমদুঃখই যে 'চরম' আনন্দ এ কথা যে-কোন দার্শনিক প্রেমিকের কাছ থেকে জান্‌তে পার্‌বে। Extremes meet, এটা যে কেবল একটা দার্শনিক মজার কথা তা নয়, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্যিকথাও।

উপরে আমার ঐ লম্বা বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্য তোমাকে বলা যে, "মহৎ" ও "অসৎ"-এর ভিতরে আছে একটা অতি সূক্ষ্ম পরদামাত্র, আর সে পরদাও আমাদেরই মনের তৈরী, আমাদের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি রেখেই। "মহৎ" ও "অসৎ"-এ অম্‌নি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই অপকৃষ্টও উৎকৃষ্ট হ'তে পারে এক পলকে, কিন্তু ভাল থেকে উত্তম হওয়ার সাধনা অনেক কঠিন। লক্ষীছাড়ার মধ্যে hero-র বীজ যেমন তাজা অবস্থায় আছে, ভাল মানুষের মধ্যে তেমন নেই। তাই আমার স্বামীজীর ঐ exclusiveness-এ আপত্তি। তাই বল্‌ছি যে মহৎ-ই হোক্ বা অসৎ-ই হোক, এ দুয়ের কোন কাজই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, চালাকি কথার অর্থ টা কি?—চালাকির অর্থ আমি যা করেছি তা তোমায় বল্‌ছি—অবশ্য আমি ওর অর্থটা করেছি ইংরেজীতে। ও-বস্তুর মূলে আছে মানুষের superficial impulse—ওর বাঙলা কর্‌লে এই দাঁড়ায়, ও হচ্ছে মানুষের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের একটা হাল্‌কা রকমের খেয়াল।

মানব সমাজ-সমষ্টির সত্যতাটা যে কি তা এখনও আমাদের চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। সমাজ দেশ জাতি ধর্ম্মের মধ্যে যে এত হিংসা দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলেছে সে সমস্তের তলে চাপা পড়ে' রয়েছে যে একটা প্রেমের বা প্রীতির সম্বন্ধ যেটা মানবসমাজের আসল সত্য, এ কথাটা মনে কর্‌তে আমরা সবাই ভালবাসি। এই সম্বন্ধটাকেই সত্য করে' তুল্‌বার একটা চেষ্টাও যে শক্তিশালী জাতিদের মধ্য থেকেও কারো কারো দ্বারা আরম্ভ হয়েছে তাও আমরা দেখ্‌ছি ও শুন্‌ছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে জিনিসটা বিশ্বমানবের মধ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে সে জিনিসটির নাম হচ্ছে—নামটি অতি পুরাতন ও ইংরেজীতে struggle for existence—যেটার বাঙলা আমরা করেছি জীবন-সংগ্রাম।

এই যে জীবন-সংগ্রাম, এই যে struggle for existence, এ জিনিসটি বর্ত্তমানে এমনি সত্য হ'য়ে উঠেছে যে যেখানে দেখ্‌বে কোন struggle নেই সেখানেই জান্‌বে কোন existence-ও নেই—অবশ্য existence কথাটা এখানে আমি তার বিশিষ্টার্থে ব্যবহার কর্‌ছি, অর্থাৎ—কেবল বেঁচে থাকা নয়, আপনাকে নিত্য নব নব রূপে সৃষ্টি করে' চলার অর্থে।

উপরে যা বল্‌লুম তার প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছি আমরা।

আমাদের মধ্যে যে struggle নেই, অন্তত বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না, তা আর সব জাতির মুখেই শুন্‌তে পাবে। তাদের মতে আমরা হচ্ছি শান্তিপ্রিয় জাত। আমরা যে এত শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলুম তার কারণ, আমাদের মধ্যে এমন কোন একটা বিশিষ্ট সত্য স্পষ্ট হ'য়ে

ছিল না, যাকে রূপ দেওয়ার একটা অদম্য প্রেরণা আমরা অনুভব করতুম, অর্থাৎ—বিশিষ্টার্থে আমাদের কোন existence, পেলে না পেলেও, অন্তত সুপ্ত হ'য়ে ছিল—এক কথায়, আমাদের অন্তরাত্মা মৃত হয়ে উঠেছিল। তবু যে আমরা দেহ নিয়ে বেঁচে ছিলুম সেটা নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মের জোরে এবং পরের কৃপায়। কেননা আমরা নিজের কাছে নিজে যত শূন্য হ'য়ে পড়েছি পরের কাছে আমাদের মূল্য তত বেড়ে গিয়েছে। একের পর প্রত্যেক শূন্যের মূল্য যে দশগুণ এ ত স্কুলের ছেলেরাও জানে। নিজের কাজে আমরা যখন অকর্ম্মা হ'য়ে উঠেছি পরের হাতে তখনই আমরা সকর্ম্মক হ'য়ে উঠেছি। এটা খুবই স্বাভাবিক। বেকার লোককেই বেগার খাটান সুবিধা, এটা বোকাও বোঝে।

কিন্তু আমরা যে শান্তিপ্রিয়, সেটা আজ কাল আর তেমন জোর করে' বলা চলে না। কেন না আমাদের মধ্যেও struggle দেখা দিয়েছে। তার মানে, আমরা আমাদের existence-কে সত্য করে' positive করে' লাভ করেছি—আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তা পৃথক সত্তা অস্পষ্ট হ'লেও দেখা দিয়েছে—এবং সে সত্তাকে ফুটিয়ে তোলবার সেটাকে বাইরের জগতে সাহিত্যে কাব্যে কথায় রাজনীতিতে সমাজনীতিতে মূর্ত্ত করে' তোলবার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্খা আমরা আজ অনুভব কর্‌ছি। তাই আজ আমরা পলিটিক্সে নেমেছি। যে বাধা আমাদের বাহিরটা জুড়ে বসে' আছে সেই বাধাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছি। আমরা আজ বল্‌ছি, "হে ইংরেজ, যতদিন আমরা শূন্য পাত্র ছিলুম ততদিন সেখানে তুমি তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা, তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য, তোমার কোট-প্যাণ্ট, চা-চুরুট, টেবিল-

চেয়ার দিয়ে সাজিয়েছে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় নি ; কিন্তু আজ আর আমরা শূন্য নই, আমাদের অন্তরাত্মা আজ সাড়া দিয়েছে তার পিছনের হাজার পাঁচেক বৎসরের সাধনা অভিজ্ঞতা জ্ঞান নিয়ে। আজ আমাদের মনে একটা প্ল্যান জেগে উঠেছে। সেই প্ল্যান আঁকতে আমাদের জায়গা চাই, তাতে রং ফলাতে আমাদের আলো চাই বাতাস চাই। আজ তোমার রাজনীতি, তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য-কলা, তোমার হ্যাট্-কোট টেবিল-চেয়ার যে আমাদের সব জায়গাখানি জুড়ে বসে' আছে তাতে আমাদের আজ ভীষণ আসে যাচ্ছে। সুতরাং সে সব সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের নিজেদের মনের প্ল্যানকে মূর্ত্ত করব সফল করব। কেননা দুটো জিনিস যে একই জায়গা অধিকার করে থাকতে পারে না তা বহু বহু আগে ইউক্লিড বলে' গেছেন এবং সেটা এ পর্য্যন্ত অপ্রমাণিত হয় নি।" এই হচ্ছে আমাদের পলিটিক্সের ভিতরের কথাটা। পলিটিক্যাল ভাষায় একেই বলি আমরা স্বাধীনতার আকাঙ্খা।

Fact-হিসেবে দেখ্‌ছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কায় আমাদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা জেগেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারের স্পর্শে আমাদের জাতীয় অহঙ্কার প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে না এলে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা আজ জাগ্‌ত না। ও-কথা মনে করায় আমাদের অনেকেরই প্যাট্‌রিয়টিক্ অহঙ্কারে আঘাত লাগে। তবে এটুকু বোধ হয় আমরা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারি যে, এযুগে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাবার পাশ্চাত্য সভ্যতাই হচ্ছে নিমিত্ত। ইংরেজী কাব্য ইতিহাস ও ইংরেজের বুটের গুঁতো—এ দুই-ই

আমাদের মন ও দেহকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করছে আত্মবশ হবার জন্যে।

কিন্তু যে বস্তুটির আমরা একচেটে ব্যবসা করি, অর্থাৎ—আধ্যাত্মিকতা, যার মানে আমাদের সবারই মতে আমাদের আত্মার নিগুর্ণ অবস্থা, হয় ত সেই আধ্যাত্মিকতার গুণে ইংরেজি কাব্য ইতিহাস আমাদের আত্মাকে যতটা উদ্বুদ্ধ না করেছে ইংরেজের বুটের গুঁতো আমাদের দেহকে তার চাইতে ঢের বেশি উত্তেজিত করেছে। বিলিতি কাব্য ইতিহাস আমাদের মনে দাগ কেটেছে, বিলিতি বুট আমাদের গায়ে তার চাইতে অনেক স্পষ্ট ও অনেক গভীর দাগ কেটেছে।

এর প্রমাণ পাচ্ছি আজ আমরা আমাদের পালিটিক্সে, যা আজ আমরা মনে প্রাণে করছি। আমাদের পলিটিক্স আমি দেখ্‌ছি একটা চালাকির খেলা, অর্থাৎ—জাতীয় বুদ্ধির একটা superficial impulse. এ কথায় আমি কি বল্‌তে চাই তা তোমায় বল্‌ছি।

যে সব দেশে রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বিদেশী নয় সে সব দেশে রাজনীতি ও সমাজনীতি আলাদা নয়। সে সব দেশে একটা আর একটারই ফল। ব্যষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে জড়িয়ে গড়ে' ওঠে সমাজনীতি, আর সমষ্টি ও সমষ্টি, জাতি ও জাতি, এক দেশ ও আর এক দেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে নিয়ে গড়ে' উঠেছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। কিম্বা এক জাতির মধ্যেই ব্যষ্টির প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার হিসেব হচ্ছে সমাজনীতিতে, আর সমষ্টির সাম্বৎসরিক জীবনযাত্রার হিসেব হচ্ছে রাজনীতিতে। অথবা প্রতিটি ব্যক্তি প্রত্যেকদিন যা করেন তাই হচ্ছে সমাজনীতি আর রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বৎসর ধরে' যা করেন তাই হচ্ছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। যে দিক

থেকেই দেখ না কেন, দেখ্‌বে একটা আর একটা থেকে বিচ্ছিন্ন ত নয়ই, বরং একটা আর একটার বৃহত্তর রূপ—রাজনীতিটা সমাজ-নীতিরই বৃহত্তর রূপ। এবং এটেই স্বাভাবিক অবস্থা।'

কিন্তু এই স্বাভাবিক অবস্থা সেইদিন থেকে আমাদের দেশে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌ল যে দিন থেকে আমাদের রাজা এসে হ'ল বিদেশী। সেইদিন থেকে আমাদের সমাজনীতি দেশের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌ল। তখন থেকে ভিন্ন দেশ ভিন্ন সমাজ ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন সম্বন্ধই রইল না। ফলে ধীরে ধীরে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে উঠ্‌লুম তখন আর জাহাজের খবর রাখ্‌বার আমাদের কোন প্রয়োজনই রইল না। তার ফলে ধীরে ধীরে রত্নগর্ভা সপ্তসিন্ধু আমাদের কাছে জাতমারা কালাপানি হ'য়ে উঠ্‌ল। বাহির আমাদের কাছে যত সংকীর্ণ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল আমরা ততই আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। প্রাণ যখন আপনাকে চারিদিকে ছড়াবার জায়গা পেলে না, আত্মা তখন আমাদের বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ঊর্দ্ধে আকাশ ফেড়ে আর অধে মাটী ফুঁড়ে।

কিন্তু আমাদের হাত পা চোখ কানের যেমন একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতকে লঙ্ঘন ক'রে কিছু একটা যদি অতিলম্বা বা অতি-বৃহৎ হ'য়ে ওঠে তবে সেটা যেমন বিশ্রী ও অসুন্দর হ'য়ে পড়ে এবং চতুর্ভুজ বা লম্বকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, তেম্‌নি দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতের সামঞ্জস্যকে এড়িয়ে যদি ওর একটা একান্ত হয়ে দাঁড়ায় তবে তাও বিলক্ষণ বিশ্রী ও অসুন্দর হ'য়ে ওঠে। তাই আত্মার এ রকম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আমরাও অসুন্দর হ'য়ে উঠেছি আমাদের মনে প্রাণে জীবনে। যদি

বল, আমরা যে অসুন্দর তার প্রমাণ কোথায় পেলে?—তার উত্তর চোখ খুলে একবার আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে সৌন্দর্য্যহীনতা।

সে যাই হোক্, মুসলমান গেল ইংরেজ এল; কিন্তু আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির ছিন্নসূত্র আর জোড়া লাগল না। বরং আরও বিপরীত হয়ে উঠল। কেননা, মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য ছিল ধর্ম্মের, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হ'ল ধর্ম্মের ত বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বর্ণেরও। ওর ফলে আমাদের চতুর্বর্ণ লোপ পেয়ে আমরা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালুম দু'বর্ণে—শ্বেত আর কৃষ্ণে। আলো অন্ধকারের যোগ কবে সম্ভব হয়? সুতরাং এই আলো আর অন্ধকারের যোগ কোনকালে সম্ভব হ'ল না। ফলে ইংরেজের রাজনীতির হাওয়া আমাদের সমাজনীতির গায়ে লাগল না, আর আমাদের সমাজনীতির পবিত্র ধর্ম্মভাব ইংরেজের রাজনীতিকে কোট্-প্যাণ্ট্ ছাড়িয়ে ধুতি-চাদর ধরাতে পার্‌ল না। ফলে, আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা আশ্চর্য্য রকম গৌরবের হ'য়ে উঠল। আমাদের আত্মা একটা বিরাট পুরুষ হ'য়ে সমস্ত জল স্থল আকাশ অধিকার করে' চিদ্‌ঘন নির্গুণ ব্রহ্মবৎ বিরাজ কর্‌তে লাগলেন; কিন্তু আমা-দের দেহের কোন খোঁজ খবরই রইল না যে, তা থাক্‌ল কি গেল।

এতে ফল হ'ল এই যে, ইংরেজ দেখলে মহা বিপদ। সে ভারতের রাজা হ'য়ে বসেছে। রাজা হলে রাজ্যে প্রজা চাই। আমাদের যে-রকম ভাবে যে-দিকে গতি তাতে আমরা যে সবাই নিছক আত্মা হ'য়ে উবে যাব না তার নিশ্চয়তা কি? তখন সে রাজ্য কর্‌বে কাকে নিয়ে? মাটীর মূল্য না তখনই যখন তার উপরে মাটীর মানুষও

থাকে। তাই ইংরেজ তখন স্থির করলে যে, সে আমাদের শিক্ষা দেবে তার ভাবে ও তার ভাষায়। কেননা, তার সাহিত্য হচ্ছে মাটীর ও মানুষের এবং মাটীর মানুষের গল্প দিয়ে ভরা। তার গানের ও গল্পের প্রধান সুর হচ্ছে মাটীর মানুষের আশা-আকাঙ্খা ভাব-ভাষা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ যশ-গৌরবের অনুপ্রেরণা দিয়ে মণ্ডিত ও অনুরণনা দিয়ে ঝঙ্কৃত, তার মনের কথা প্রাণের ব্যথা সব ইহজগতের আনন্দের স্পর্শে হিল্লোলিত উল্লসিত। তার ভরসা, যদি সে-কথার সে-ব্যথার চমৎকারিত্বে মোহিত হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক নিলিপ্ততা কতকটা কেটে যায় এবং আমরা এই মাটীর 'পরে নেমে আসি আমাদের দেহ মন প্রাণ নিয়ে, তবে তার রাজ্যও থাকে রাজত্বও চলে।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে আমাদের মনের স্পর্শ ঘটলে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার শুচিতা ও শুদ্ধতা আমরা হারিয়ে যাব এই মনে করে' আমাদের মধ্যে অনেকে সে শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন; কিন্তু দু'এক জনা এমন ছিলেন যাঁরা আত্মাকে মন প্রাণ দেহের নিতান্ত অনাত্মীয় বলে মনে করতেন না, তাঁরা বললেন, কুচ্ পরোয়া নেহি, আমরা ইংরাজি শিখব, ইংরাজের সাহিত্য পড়ব, তার ভাব ভাষার আলোচনা করব। ফলে একদিকে গালাগালি আর একদিকে হাততালির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

আমি আগেই বলেছি, ইংরেজী সাহিত্য হচ্ছে মাটী ও মানুষ এবং মাটীর মানুষের কথা। তার আশা আকাঙ্খার ছবি সেখানে আঁকা—আর সে এমনি মনোহর করে এমনি চমৎকার করে, এমনি একটা বৃহতের সুর তাতে মাখান যে, তা মানুষের প্রাণে সোজা ও সহজ হ'য়ে পৌঁছে যায়। আমাদের আত্মিক অবস্থার যত উঁচু evolution ই

হোক্ না কেন আমরা মানুষ ত বটে। তাই ইংরেজের কাব্য ইতিহাস আমাদের প্রাণে এমনি একটা তরঙ্গ তুল্‌ল, এমনি একটা নিবিড় ব্যথা জাগাল, এমনি একটা বহুদিনের ভুলে-যাওয়া-খেলা-ধূলোর স্মৃতি জাগ্রত করে' তুল্‌ল যে, আমাদের চোখের কোণে অশ্রু ফুঠে উঠল—মর্ম্মতল বাদলের ব্যথা-জড়িত সুখস্বপ্নে কি রকম ভরে' উঠল। আমরা সেদিন মনে মনে ভাবলুম, আত্মা জিনিসটা খুবই ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষও ত কম নয়, তার মনের প্রাণের সুখ দুঃখ, আকাঙ্খা আকিঞ্চন, হাসি অশ্রুর ভিতর দিয়ে যে এক দেবতা এসেছেন তিনি ত দীন নন্ হীন নন্,—তিনি মুক্ত তাই বন্ধনে তাঁর ভয় নেই, তিনি ঐশ্বর্য্যবান, তাই অশ্রু তাঁর মুক্তো হ'য়ে ফুটে ওঠে, তিনি আনন্দময় তাই রিক্ততা তাঁর দৈন্যের মাপ-কাঠিতে মাপা চলে না। ওর ফল হ'ল এই যে, আমরা আকাশ থেকে মাটীতে নেমে পড়লুম।

মাটীতে নেমে আমাদের হ'ল মুস্কিল। এতদিন আমরা আত্মাকে দিব্যি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে নির্ব্বিবাদে বসে' ছিলুম, পৃথিবীতে নেমে দেখলুম যে সেখানে আমাদের পা রাখবার মত একটু জায়গা মিলতে পারে কিন্তু মাথা গুঁজবার মত কোন স্থান নেই। পৃথিবীকে আমরা এতদিন ছেড়ে ছিলুম, সেই অবসরে আর সবাই তাকে বেশ অধিকার করে' বসে' আছে। ইংরেজের পুঁথিতে পড়ে ছিলুম স্বাধীনতার কথা নিজ নিজ স্বত্বের কথা অধিকারের কথা। আমরা ইংরেজকে বললুম, আমরাও ত মাটীর মানুষ, সুতরাং মাটীর কিছু অংশ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। ইংরেজ হেসে বল্‌লে, "তোমরা মানুষ কে বল্‌লে, তোমরা ত সব আত্মার দল।" সেদিন থেকে ইংরেজের কাছে আমরা

যে মানুষ তা প্রমাণ করতে বসে' গেলুম। হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট্ পরে' তার কাছে গিয়ে টুপিটি হেলিয়ে পা দুটো ফাঁক করে' বললুম, এই দেখ আমরাও মানুষ। ইংরেজ কি ভাবলে জানি নে কিন্তু জায়গা ছাড়লে না। সেদিন থেকে আমরা পলিটিক্স করতে লেগে গেলুম। আমরা বললুম, "হে ইংরাজ, তুমি আছ, কিন্তু আমিও আছি এটা তোমায় মান্‌তে হবে।" বহুদিন কেটে গেল, ক্রমে ক্রমে আমরাও বল্‌তে শিখলুম, "হে ইংরাজ তুমি আছ কি নেই তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমার মাটী আমার দেশে আমিই আছি সবার প্রথমে।" স্বাধীনতার কথা আমাদের ঠোঁটে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, আমরা বললুম, "স্বরাজ স্বরাজ।"

কিন্তু এই যে পলিটিক্স, এই যে স্বাধীনতার কথা, ও কেবল আমাদের ঠোঁটের আগে superficial-একটা চালাকি। এ স্বাধীনতা আমাদের অন্তরে অন্তরে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠে নি, আমরা ইংরেজের শেখান বিদ্যার বুলি ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াচ্ছি—কোথাও বা হুঙ্কার দিয়ে কোথাও বা গম্ভীর ভাবে। আমরা পুরো মানুষ এখনও হ'য়ে উঠি নি। কিসে বুঝি—তা বলছি।

আমি আগেই বলেছি, বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার অধীনে আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাজনীতির সঙ্গে ততটা নেই যতটা আছে তার সমাজ-নীতির সঙ্গে। ইংরেজের রাজ্য-শাসনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রত্যক্ষ contact যা আছে, তার একশ' গুণ আছে আমাদের সামাজিক শাসনের সঙ্গে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইংরেজের রাজনীতিতে যতটা আছে আমাদের সমাজনীতিতে তার

চার ভাগের এক ভাগও নেই। অথচ আমাদের সমাজ সম্বন্ধে যেমন ভাব দশ দিন আগে ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমাজের সহস্র বন্ধন। মানুষ যাতে আপনাকে উদার করে' পায় মুক্ত করে' পায় তারই বিরুদ্ধে সমাজের যুদ্ধ-ঘোষণা। আমরা যদি সত্য সত্য মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তুম, দাসত্বের শৃঙ্খল যদি সত্য সত্য আমাদের গুরুভার হ'য়ে উঠত, স্বাধীনতার সত্য আকাঙ্খা যদি সত্য সত্য আমাদের আত্মায় জ্বলন্ত জীবন্ত জাজ্বল্যমান হয়ে উঠত তবে দেখতে, আমরা আজ আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতুম—কেননা সমাজের বন্ধনই আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করে' আছে। কারণ, মানুষের প্রথম জ্ঞান ব্যষ্টিত্বের, তারপর সমষ্টিত্বের বা জাতীয়ত্বের। তাই বলছি, আমাদের স্বাধীনতার জন্য হা হুতাশ আমাদের ঠোঁটের কথা, প্রাণের কথা নয় আত্মার কথা নয়, অর্থাৎ—superficial. তাই আমাদের রাজনৈতিক নেতা বা বক্তাদের মুখে রাজনীতির খৈ ফুট্‌তে থাকে কিন্তু সমাজের দিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেই অম্‌নি তাঁদের ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে ও গলা কাঠ হয়ে যায়।

ওর কারণ কি জান?—কারণ ইংরেজের ইতিহাস। ইরেজের ইতিহাসে আমরা পড়েছি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ। ইরেজের সামাজিক জীবনে কোন দিনই সনাতনত্বের দানা বেঁধে উঠবার অবসর পায় নি। কাজেই সেখানে ইংরেজরূপী মানুষের কোন সংগ্রাম করবার দরকার হয় নি। ইংরেজের যুদ্ধ ছিল রাজার সঙ্গে। ইংরেজের পুঁথি পড়ে সেই একই জিনিস আমরা শিখেছি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যদি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ না হ'য়ে ইংরেজদের সামাজিক জীবনের একটা ওলোট-

পালোট হ'ত তবে দেখ্‌তে আজ আমরা রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম্ পুলপিট্ থেকে বাক্যবান বর্ষণ না করে' আমাদের সামাজিক আসরে নেমে অস্ত্র ধারণ করতুম। মানুষের মনের সাকার রূপ যে সমাজ এবং সমাজের বৃহত্তর রূপ যে রাষ্ট্র সেটা আমরা ভুলেছি। ইংরেজের রাজ্যশাসন প্রণালী ও ইংরেজী পলিটিক্সের পিছনে আছে ইংরেজের মন ও সমাজ। ঐখানে গিয়ে আমরা তাদের ভাষায় তাদের মনোভাব প্রকাশ কর্‌ছি। ইংরেজ যে আমাদের সে সব কথা দু'কান পেতে শুন্‌ছে তার কারণ, সে বুঝ্‌ছে যে সে সব তার নিজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ওর ফলে আমরা ইংরেজী হ্যাট্ কোট্ পরা কোন স্বরাজ-লাভ করি আর যাই করি, দেখ্‌বে এমন একদিন আস্‌বে যখন ঐ স্বরাজ ভেঙে ফেলে আবার আমাদের নতুন করে' গড়্‌তে হবেই। কেন না বিলিতি-স্বরাজের পিছনে আমাদের সামাজিক-মন নেই এবং তার পিছনে আমাদের ব্যষ্টির ধর্ম্ম নেই। সে-স্বরাজের পিছনে যা থাক্‌বে সেটা হচ্ছে বিলিতি মন ও দেশী বুদ্ধি। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।

(৩)

তোমায় কি বল্‌তে গিয়ে কোথায় ভেসে গেলুম। এইবার ফির্‌ব। কেননা অনেক বকেছি। বলছিলুম স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাটা—চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" আর এই চালাকির অর্থ হচ্ছে superficial impulse—মানুষের বাইরেকার একটা আলগা প্রেরণা।

আমরা আমাদের দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত

কর্‌তে চাই এর মানে অবশ্য এ নয় যে, দেশের মাটী ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবশালী হ'য়ে উঠ্‌বে;—তার মানে দেশের মানুষই সত্যি সত্যি উক্তরূপ বিশেষণে বিভূষিত হ'য়ে উঠ্‌বে। দেশকে মাতৃমূর্ত্তিতে গড়ে' সামাজিক জীবের মনে প্রাণে emotion জাগান সুবিধা হ'তে পারে এবং জীবন্মৃত জাতির পক্ষে যে সেটার একটা মস্ত দরকার তাও স্পষ্ট; কিন্তু দেশ মানে যে মানুষ এ কথা political economy-র সময় মনে না রাখ্‌লে লাভের সম্ভাবনা দু'গণ্ডা রস্তা। সুতরাং দাঁড়াল এই, দেশ ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে, মানে দেশের লোকেরা ধন দৌলত অর্জ্জন ও উপার্জ্জন কর্‌বে, তার অর্থ সেটা তারা বর্জ্জন কর্‌বে না।

কিন্তু বৈরাগ্যের প্রধান ও প্রথম সূত্রই হচ্ছে ঐ সব অনিত্য বস্তুকে বর্জ্জন করে' চলা। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছ দেশের ধন দৌলতের সঙ্গে মানুষের বৈরাগ্য-ভাবের কোনই সম্বন্ধ নেই—ওর একটা আর একটার ঘোর বিরোধী।

এখন মানুষ যদি ধন দৌলত যশ গৌরব অর্জ্জন কর্‌তে চায় তবে তার জন্যে তার চাই সত্য-আকাঙ্খা। এটার বোধ হয় বিশেষ ব্যাখ্যা তোমার কাছে দিতে হবে না। মানুষের আকাঙ্খার সঙ্গে যে তার কর্ম্ম-প্রেরণার বিশেষ যোগ আছে সেটা ত সবার কাছেই স্পষ্ট। যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের সত্য-আকাঙ্খা নেই সে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা সত্যভাবে নিয়োজিত হ'তে পারে না। সত্য-আকাঙ্খা বল্‌তে আমি বুঝি, মানুষের আত্মাই বল বা তার deeper self-ই বল বা তার higher consciousness-ই বল তারই সত্য—এবং মানুষের জীবনে সেই সত্যই বিকশিত হ'তে

হ'তে চলেছে—মানুষের চিন্তা কর্ম্ম ধর্ম্ম সেই সত্যেরই বর্ণে ও গন্ধে ফুটে উঠ্‌ছে—সেই সত্যেরই সুরে ও তালে বেজে উঠ্‌ছে—মানুষের জীবন সেই সত্যেরই একটা সাকার রূপ।

উপরের ঐ কথা যদি মান, তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশের লোকের আত্মায়, তার deeper self-এ যদি বৈরাগ্যই, অর্থাৎ—বিষয়-বিতৃষ্ণাই সত্য হ'য়ে থাকে তবে তার কর্ম্ম-প্রেরণা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-গৌরবের সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করবে না—সে প্রচেষ্টা তখন তার হবে একটা superficial impulse—তাতে থাক্‌বে তার বেদনা, কেননা সেটা তখন তার স্বধর্ম্ম নয়—পরধর্ম্ম। এবং আমাদের পরধর্ম্ম অন্যের স্বধর্ম্মের কাছে পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'তে বাধ্য। ভারতবাসীর অসত্য আকাঙ্খা ইংলণ্ডবাসীর সত্য আকাঙ্খার সাম্‌নে যুগে যুগে মাথা নীচু করে' থাক্‌বে।

সুতরাং দেশবাসীদের সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করতে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মায় বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে তুল্‌তে হবে তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে, সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হ'য়ে উঠবে। কেননা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টি সফল হ'য়ে আছে, তার কারণ, তা আনন্দে উৎসৃষ্ট হ'য়ে আনন্দ থেকেই আনন্দেই যাচ্ছে—সব কিছুরই আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই গতি। ঐ শেষের কথাটা উপনিষদের।

আমি উপরে যে লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লুম তা যদি না বোঝ তবে দোষ, হয় আমার কলমের, নয় তোমার মগজের।

বিলিতি মতে New Year's Greetings জানাচ্ছি, স্বদেশী ভাবে গ্রহণ কোরো। আশা করি এই ট্রাম ট্যাক্সি strike-এর মরসুমে তুমি খোস্ মেজাজে ও বহাল্ তবিয়তে বিরাজ কর্‌ছ। ইতি—

তোমার
মৃত্যুঞ্জয়

"দাস-মনোভাব"

—:০:—

'দাস-মনোভাব' বস্তুটি যদিও বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও ভারতবাসীর খাসদখলে, তবু এটা যে পেয়েছি আমরা ইংরাজ-রাজের কাছ থেকে—তা অস্বীকার কর্‌লে একটা দিনের আলোর মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট সত্যেরও অপলাপ করা হবে।

আমরা যে পরাধীন, অর্থাৎ কিনা দাস-জাতি, সে ইংরাজেরই প্রসাদাৎ।

তারপর প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, এই নন্-কো-অপারেশনের নব-যুগে যখন কংগ্রেস্-মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল যে, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করে' স্বাধীন হতে হবে, তখন আমি কেন দাস-মনোভাবের প্রভাবের পরিচয় দিতে যাচ্ছি।—তার উত্তরে আমার বল্‌বার আছে এই যে, দাসত্বের শিক্‌লি কেটে' ফেলে' দিয়ে স্বাধীন হয়ে গেলে ত দাস-মনোভাব সম্বন্ধে বল্‌বার আমি অধিকারী থাক্‌ব না। তখন স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতবাসী আমি, এই অনধিকার-চর্চ্চা কেনই বা কর্‌তে যাব? তাই আগে-ভাগেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করে' নেওয়া ভাল মনে করি। এ আলোচনায় যে কারুর চোখ ফুট্‌বে এমন আশা করি নে, তা বলে' বুক ও যে ফাট্‌বে এমন আশঙ্কাও নেই।

মানুষের প্রকৃতি-ভেদে যেমন মনোভাবের আকার ও প্রকার

ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, জাতিরও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। দুষ্ট লোকের মনটিকে যেমন দুষ্টামি-নষ্টামি অহরহ তোলপাড় করে' তোলে, তেমনি আবার ভাল লোকের মনকে নানান রকমের সদ্ভাব এসে উচ্ছ্বসিত করে দেয়। স্বাধীন জাতি আর পরাধীন জাতির প্রকৃতিতে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। একটি বেড়ে' ওঠে যে আব্‌-হাওয়ার মধ্যে তা মুক্ত, সুন্দর ও অনাবিল; আর একটি বেড়ে' ওঠে যার ভিতর দিয়ে সে হচ্ছে বদ্ধ, কুৎসিৎ ও আবিল। সুতরাং স্বাধীন আর পরাধীন—এ দু'য়ের মনোভাবের বিকাশ ও প্রকাশ, দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা একেবারে ভিন্ন রকমের। একের সাথে অপরের মিলও নেই কিছু, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্যও নেই কিছু।

দাস-মনোভাব দাসত্বের ফুল না হলেও যে মূল, এতে আর ভুল নেই। কেননা দাস-মনোভাবকে আশ্রয় করেই দাসত্ব স্বাধীনতার আগাছা ঝেড়ে-ঝুড়ে বেড়ে' ওঠে। দাস-মনোভাবরূপ মূল যেদিন ছিঁড়ে যায়, অর্থাৎ কিনা, দাস-জাতির ঘুম ভাঙ্গে, সেদিন এই দাসত্ব-বিটপী—সে যত প্রকাণ্ডই হোক্ না কেন—বড় বড় শাখা-প্রশাখা সমেত একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যায়। এ জন্যেই দাসত্বের ব্রহ্মারা দাস-মনোভাবের সৃষ্টিতেই তুষ্টি লাভ করতে পারেন না—তাঁরা চান বিষ্ণুর মত এর স্থিতি। কিন্তু মজা হচ্ছে সেই খানেই, যেখানটায় এঁরা প্রলয়কর্ত্তা শিবকে একেবারে বাদ-সাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের লীলা-খেলা শেষ করতে চান।

দাস-মনোভাবের স্থায়ীত্বের উপর দাসত্বের জীবন নির্ভর করে বলেই ব্রহ্মারা এইটিকে পুষ্টিকর ও তুষ্টিকর আহার্য্য দিয়ে সজীব ও সতেজ করে' রাখতে ব্যস্ত। এর দরুণই ভারতবর্ষের হর্ত্তাকর্ত্তা

বিধাতারা আমাদের শিক্ষার উপরে এত কড়া নজর রাখেন। শিক্ষা-নীতি কেমন ছাঁচে ঢাললে, কোন্ কোন্ পুঁথি পাঠ্যপুস্তক করলে, কি ধরণের শিক্ষক নিয়োগ করলে ছেলেদের মনোভাবগুলিকে ঠিক দাস-জাতির উপযোগী করে' গড়ে' তোলা যায়, তা নিয়ে আমাদের রাজগুরুরা যতটা মাথা ঘামান আর কিছুতে তেমনটি ঘামান কি না জানি নে। ইস্কুলের চতুঃসীমানার মধ্যে স্বদেশ-ভক্তদের আলেখ্য-দর্শন কারুর ভাগ্যে ঘটে' ওঠে না। স্বাধীন দেশে রাজ-ভক্তি বল্‌তে বুঝায় স্বদেশ-ভক্তি; আর এ দেশে স্বদেশ-ভক্তি বললে সচারাচার বিদেশীরা বুঝেন বিদেশী-বিদ্বেষ। ভক্তি কখনো বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলে সব সংশয়ের মেঘ দূর হয়ে শাসকদের মনটা খোলসা হয়ে যেত।

ইস্কুলের এমন রুদ্র শাসন ও দাসত্বের আওতার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও এক-একটি ছেলে দাস-মনোভাবের প্রবল প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করে' বিশ্ব-বিজয়ী বীরপুরুষের মত মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায়; অর্থাৎ—স্কুলবুকের ভাষায় বলতে গেলে সুশীল ও সুবোধ না হয়ে বেণীর মত দুরন্ত হয়ে ওঠে, এত বাধা বিঘ্নের মধ্যে এমনটি যে হয়ে ওঠে সে 'কোটিকে গোটিক', আর অমন হয়ে ওঠা, সে হচ্ছে প্রাক্তনের পুণ্যফল।

কিন্তু এই যে 'কোটিকে গোটিক'—সে যখন ইস্কুলের সীমানা ছেড়ে বাইরের মুক্ত মাঠে পা বাড়াল অমনি গোয়েন্দা-ইস্কুলমাষ্টাররা এসে তাকে তেড়ে ধরলেন, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতন তার সঙ্গী হয়ে বসলেন। সেই থেকে যে বসতে খেতে, বলতে ফিরতে এঁরা

তার পিছনে লাগলেন—তার গৌণ উদ্দেশ্য যাই হোক, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনি ভাবে জ্বালাতন করে' তার উপচীয়মান স্বাধীন মনো-ভাবকে অন্ধ ও বদ্ধ করে' দাস-মনোভাবের দিকে তার মতি ও গতি ফিরিয়ে দেওয়া। ব্যুরোক্রেশীর বিচিত্র মনোভাবের খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে, দাস-জাতির দাস-মনোভাবকে জাগিয়ে রাখা তাদের নীতি, আর এইটিকে চাগিয়ে রাখা তাদের রীতি। এ নীতির অনুসরণ ও এ রীতির অনুবর্ত্তন না করলে তাদের শাসন একেবারেই বিফল ও শাসন-যন্ত্র একদিনেই বিকল হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কা নিশিদিন তাদের মনের মধ্যে ডঙ্কা বাজিয়ে ঘুরছে। এ আশঙ্কা যে অমূলক, তা বলতে পারি নে। যাঁরা দাসত্বের কারবার করেন তাঁদের মনোবিজ্ঞানে বিশারদ হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজরা ভারতীয় দাস-জাতির মনোবিজ্ঞান নিয়ে যে প্রচুর গবেষণা করেছেন, তা তাদের শাসন-নীতি থেকেই পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয় বেশ-ভূষা ছেড়ে যে সব দাঁড়-কাক বিজাতীয় পোষাকে ভূষিত হয়ে ময়ূর সাজেন তাঁরা আমাদের মনিব-সমাজে মেলামেশার কতকটা অধিকারী হন। গৌরাঙ্গেরা এই শিখি-পুচ্ছধারী কৃষ্ণাঙ্গদের যে খুব সুনজরে দেখেন তা অবশ্য নয়। তার প্রমাণ, রেলে ষ্টীমারে হরদম গোরা আর কালার সংঘর্ষ থেকেই মিল্‌বে। সাদার পোষাক-পরা এই কৃষ্ণদাসটিকে নিয়ে কত রং-ঢং তারা করে থাকে। কিন্তু ঐ উপহাস-পরিহাসের মধ্য দিয়ে, ঐ মেলামেশার ভিতর দিয়ে তার স্বদেশীর প্রতি এদের বিদেশী ভাব প্রতিমুহূর্ত্তে মারাত্মক ও বিষাক্ত বাণ হানছে। বিদেশীর সে বাণ স্বদেশীর চর্ম্ম ভেদ করে মর্ম্ম পর্য্যন্ত গিয়ে বিঁধলেও কালার তাতে বেদনা-বোধ হয় না। কারণ, 'দাস-মনোভাব'

গ্রস্থ যে, তার স্বজাতির প্রতি বেদনা-বোধ একেবারে লুপ্ত না হলেও সুপ্ত হয়ে থাকে।

দাস-মনোভাব যাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছে, 'সে স্বদেশী ঠাকুর ফেলে' বিদেশী কুকুরকে পূজা করে' তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করে। এতে তার নিজের মোক্ষ-লাভের পথ পরিষ্কার হোক্ আর নাই হোক্, তার স্বদেশ ও স্বজাতির সজ্ঞানে স্বর্গ-লাভের পথ যে নিষ্কণ্টক হয় তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। দাস-মনোভাবের প্রভাবে মানুষের ভিতর-বাহির দুই দিক্‌কার চেহারাই হুবহু বদ্‌লে যায়। গোলাম যে সেলাম ঠোকার জন্যেই জন্মেছে, তা তার চেহারা দেখেই মালুম হয়। মনিবের দর্শনে গোলামের হাত সেলামের জন্যে উরুদেশ থেকে ললাটদেশ পর্য্যন্ত স্বতই উত্থিত হয়ে থাকে, মাথা ফলবান বৃক্ষেরই মত আপনা-আপনি নুইয়ে পড়ে, মেরুদণ্ড বেতসী-লতার মতন বক্র হয়ে যায়, আর চোখে ভেসে ওঠে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি, মুখে আসে স্তোক-বচন ও বুকে অনুভূত হয় হৃৎপিণ্ডের ঘন স্পন্দন। এমত অবস্থায় গোলামকে দেখে' ঠিক করা মুস্কিল—সে পুরুষ, কি কাপুরুষ কি না-পুরুষ। গোলামের এই যে নেতিয়ে পড়া এলিয়ে পড়া ভাব, এ আয়ত্ত করতে তেমন কোনো সাধনা বা চেষ্টা-চরিত্রের দরকার হয় না। দাস-মনোভাব দাস-জাতির অস্থি-মজ্জায় ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হলে আপনাহতেই গোলামী-ভাব ফুটে' ওঠে, গোলামী-স্বভাব গড়ে' ওঠে। জিনিস গড়তে যত সময় ও পরিশ্রম দরকার, ভাঙ্গতে ততটার আবশ্যক হয় না। কিন্তু দাস-মনোভাব কিংবা গোলামী-স্বভাবের বেলায় ও-কথা খাটে না। দাস-মনোভাবকে ভিত্তি করে' ফুটে' ওঠা গোলামী-ভাবকে নষ্ট করতে হলে ও গড়ে'-ওঠা

গোলামী-স্বভাবকে ধূলিসাৎ করতে হলে দাস-মনোভাবরূপ দৃঢ় ভিত্তিকে ভেঙ্গে' চুরমার করে' দিতে হবে। তবে, এ ভিত্তি গড়া যত সহজ ভাঙ্গা তত সহজ নয়। তাই সাধনার প্রয়োজন। আর এই সাধনায় সিদ্ধির উপরই জাতির স্বাধীনতা-ঋদ্ধি নির্ভর করে।

বনের বাঘের চেয়ে মনের পাপ যে বেশি হিংস্র তা কে না জানে। দেহের দাসত্ব অপেক্ষা মনের দাসত্ব যে কত ভীষণ ও সাংঘাতিক তা অস্বীকার করবার যো নেই। দেহ পরাধীন হলেই মনটিও যে ও-রকমটি হবে তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু মন পরাধীন হলে দেহের স্বাধীনতা যে সঙ্গে সঙ্গেই উপে যায় তা অতি সত্য কথা। এই জন্যেই পৃথিবীর ঋষি-মনীষীরা আলোচনা করেন এই একটা তন্ত্র নিয়েই, যেটা রাজতন্ত্রও নয়, গণতন্ত্রও নয়—সেটা হচ্ছে মনতন্ত্র। মনতন্ত্রের শাশ্বতী নীতি—মনের বন্ধন-মোচন, আত্মার মুক্তি।

দাস-মনোভাবের প্রভাব যে কত ভীষণ কত মারাত্মক, তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি। যা বলতে যাচ্ছি তা মন-গড়া গল্প নয়—নিজের চোখে-দেখা প্রত্যক্ষ ঘটনা। সে বছর তিনেক আগেকার কথা—আমি তখন বাঙলার উত্তর প্রান্তে ভুটান-পাহাড়ের ধারে একটি স্থানে রাজ-অতিথিরূপে পরমসুখে জামাই-আদরে বাস করছিলুম। সেখানকার এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালার দোকানে আমি প্রায় প্রতিদিনই সকাল-বিকাল যেতাম। মিঠাইওয়ালার অনেক দিনের একটি পোষা টিয়া পাখী ছিল। একদিন বিকালে গিয়ে দেখি, মিঠাইওয়ালার বদন বিরস নয়ন ছল-ছল আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অশ্রাব্য বচন। তার আশে-পাশে কয়েকটি চা-বাগানের কুলী বসে' আছে। সবার হাব-ভাব, আকার-প্রকার দেখে' মনে হল যেন, মিঠাইওয়ালা মিছির-ঠাকুরের

উপর কোনো আকস্মিক বিপদপাত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"ক্যায়া হুয়া মিছির-ঠাকুর?" বড় আপ্‌শোষ করে' সে তখন সুমুখের সড়কের ধারে একটা বড় গাছের ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্লে—"বাবু-সাহেব, বড়ী আপ্‌শোষকি বাত্, হামারা পাখীঠো ছুট্ গিয়া" এই বলেই সেই টিয়া পাখীকে উদ্দেশ করে' গালাগালি করতে সুরু করলে—"শ্যালা নিমকহারাম, এতনা রোজ, কেত্‌না খিলায়া তব্‌ভী চল্ গিয়া।" মিঠাইওয়ালা মিছির-ঠাকুরের সাথে আমার বেশ ভাব থাক্‌লেও, আর তার দোকানের একজন বাঁধা খদ্দের হলেও, তার এই মনোবেদনায় আমার প্রাণে কোনো সমবেদনার উদ্রেক হয় নি। পায়ে শিক্‌লি-পরা খাঁচার পাখী বন্ধন-মুক্ত হয়ে স্বাধীন বনের পাখীর মত গাছে বসে' নীল আকাশের তলে মুক্ত হাওয়ার মাঝে ডাকছে শুনে আমার সারা হৃদয়খানি অনাবিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তারপর সেদিনকার মত আমি আমার কুটীরে ফিরে গেলাম। বন্দী আমি—রাতে শুয়ে শুয়েও এই পাখীটির কথাই ভাবলুম, পাখীর কি হল—সে কি খাঁচায় ফিরে এল, না আপন-মনে বিজন বনে উড়ে' চলে গেল, শুধু তা জানবার জন্যে। আবার সকাল-বেলা দোকানে গিয়ে হাজির হয়ে মিছির-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলুম্—"পাখীঠো মিলা মিছির?" হাসি-মুখে মিছির-ঠাকুর জবাব দিলে—"কাহে নেহি মিলেগা বাবু-সাহেব! পাখীঠো সাম্‌কা বক্ত আপ্‌হি আপ্ আকে পিঁজরামে ঘুসা।"

দাসত্বের কেমন মোহ! পিঁজরার কি সম্মোহিনী শক্তি! শিক্‌লির কত আকর্ষণ! খাঁচার পাখী স্বাধীনতা পেলেও আবার সাধ করে' স্বেচ্ছায় নিজে এসে খাঁচায় ঢুক্‌লে—এ যে দাস-মনোভাবের

প্রভাব বই আর কিছুই নয়। পাখীর বেলা যা, মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। আমেরিকায় নিগ্রোদের যখন দাসত্ব-মোচনের প্রস্তাব হল, তখন নাকি দাসদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব জেগে উঠেছিল, তাদের অনেকেই নাকি তখন মনিবদের কাছে কান্না-কাটি করে' বলেছিল যে, মনিব ছাড়া হলে তাদের কি উপায় হবে।

দাস-জাতির মনস্তত্ত্বের আলোচনা করলে এই নিখুঁত ও নিছক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, Physical slavery বা দৈহিক দাসত্বের চাইতে mental slavery বা মানসিক দাসত্ব বড় সাংঘাতিক, ভীষণ মারাত্মক। সুতরাং মনের বন্ধন মোচন করে' তাকে মুক্তি দিতে হলে দাস-মনোভাবকে উন্মূলিত করে' ফেলতে হবে। মনই যদি স্বাধীন হল, তবে দেহকে আর কয়দিন বন্দী করে' রাখা চলে?

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

মন্তব্য—

দাস-মনোভাব ওরফে Slave mentality কথাটি কিছুদিন হল এদেশে মুখে মুখে ফিরছে। সকলে যখন একটা কথা বলে তখন সকলের মনে তার অর্থ স্পষ্ট কি না, এ সন্দেহ সহজেই হয়। তবে যে বিষয়ে সন্দেহ সেই সে হচ্ছে এই যে, সকলে সেটা এক অর্থে বোঝে না।

বাঙলার যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল দাস-মনোভাব বলতে কি বোঝেন তার পরিচয় উপরোক্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "উড়ো-চিঠি"তেও এই একই বিষয়েরই আলোচনা আছে। একটির পর আর একটি পড়লেই, পাঠকমাত্রেরই কাছে একের মনোভাবের সঙ্গে অপরের মনোভাবের

স্বাতন্ত্র্যটুকু সহজেই ধরা পড়বে। এই লেখা দুটিই প্রমাণ যে, বাঙলার যুবক-সম্প্রদায় কথা একমাত্র আউড়েই মনস্তুষ্টি লাভ করেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে সে কথার মানে নিজের মনে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। কথার পিছনে মানে খোঁজার প্রকৃতি যে জাতের অন্তরে আছে তাদের মুখে কোন কথাই ছেরেফ বুলি হয়ে উঠতে পারে না। বাঙালির বিশেষত্বই এইখানে।

—সম্পাদক

প্রকৃতির অভিসার

—*—

স্নেহব্যগ্র দুটি বাহু প্রসারি অমন,
কেগো তুমি শ্যামাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া বালা!
ত্রস্ত আলিঙ্গনে মোরে করিয়া বন্ধন
কি কথা কহিবে কানে আজি সন্ধ্যাবেলা?
স্বপনসুষমা ঘেরা উপবনে হেথা
কেগো তুমি পাগলিনী বাঁধিয়াছ বাসা,
চিত্তে যদি জাগে তব প্রকাশের ব্যথা—
কেন মূক কণ্ঠে তব নাহি কোন ভাষা?
এত শোভা চারি ভায়, বনানীর গায়
আলোছায়া করে খেলা গোধূলি-বেলায়;
আজি এ স্বপনপুরে ঘনবনচ্ছায়
খুলিব কি হৃদিদ্বার তোমায় আমায়?
নিরজন বনপথে বসি তৃণাসনে,
গাহিব কি আজি গান আপনার মনে?

শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী

প্রকৃতির প্রতি

—:*:—

আসিয়াছি আজি পুনঃ দুয়ারে তোমার,
অয়ি শুভে, অয়ি মম শ্যামা বনরাণী!
শ্যামল আঁচলখানি বিছায়ে আবার,
তব শান্ত বক্ষোপরে লহ মোরে টানি।
যা-কিছু সম্বল মম বাণী-সাধনায়
নিঃশেষে বিকায়ে দিব চরণে তোমার—
দেখাও সে লীলা তব দীন অভাগায়,
সেই তব শ্যাম হাসি অনন্ত শোভার!
চারিপাশে আনাগোনা কর্ম্মকোলাহল,
তার মাঝে স্থান মোর নাহিক কখন—
সায়াহ্নের ম্লান ছায়ে মৌন ধরাতল,
তারি মাঝে সঙ্গোপনে রহিব দু'জন।
মূক বিস্ময়ের রেখা নয়নের কোণে,
জানাইবে কত প্রীতি জাগে মোর মনে।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী

বন্ধু

—:*:—

(ক)

দেওঘর
২০শে মাঘ, ১৩২১

সতীশ

একটা বিপদে পড়ে তোমায় লিখছি এই চিঠি। হঠাৎ এখানে আমার কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

যেরকম অনুমান করে এসেছিলাম, এখানে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্চে দেখছি; আরও বোধ হচ্চে, যতদিন থাকব ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশিদিন থাকতে হবে। এই সব জন্যই, যে টাকা আছে মনে হচ্চে যে তাতে কুলোবে না।

অথচ উপস্থিত এখান থেকে আমার নড়বার জো নেই। এ বিদেশে এদের কার কাছে রেখে যাই! আর এখানে টাকা পাওয়া একরকম অসম্ভব। কারণ যদিও ২।৫ জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এখানকার, কিন্তু তাঁরা সকলেই আমার মত হাওয়া খেতে এসেছেন। তাই তোমাকে লিখছি। যদি সম্ভব হয় টাকাটা একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দিয়ো, কারণ দিন দিন যেমন টাকা ফুরিয়ে আসচে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দুর্ভাবনাও বাড়চে।

যদি চাও তবে আষাঢ় মাসে দেশে ফিরেই তোমায় টাকা দিতে পারব; কিন্তু যদি আশ্বিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার, তবে দেবার সময় আমার একটু সুবিধা হয়।

তুমি বোধ হচ্চে এ সব দেশে কখনো আস নি। চমৎকার দেশ—এখানকার হাওয়ায় যেন আনন্দ ভেসে বেড়াচ্চে। যদি পার একবার এস এদিকে, এবং আমার থাকবার মধ্যে এলেই আমি সুখী হয় জানবে। ইতি—

প্রমথ

পুঃ—সঙ্গে একখান হাণ্ডনোট দিলাম। তুমি হয় ত তার দরকার মনে নাও করতে পার, কিন্তু আমার মনে হয় যার যা দস্তুর তা মেনে চলা দরকার। বড়জোর তুমি এটাকে অধিকন্তু বলতে পার, কিন্তু সেটা দোষের নয়, এবং আশা করি সে জন্য রাগ করবে না।

প্রঃ

(খ)

রাজগ্রাম

১৭।১১।২১

ভাই প্রমথ

ভাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েচে বলে নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে করচি। আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, যদিও ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই!

এমন ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিইচি কিছুদিন থেকে, যে তোমার চিঠির কথা প্রায় ভুলেই গিইছিলাম। কথাটা মনে হবহব সময়ে তোমার দ্বিতীয়

চিঠি পেলাম। তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেচ দেখে আর দেরী করতে পারলাম না।

যদিও শুনে তোমার কোনই লাভ নেই, তবু আমার নিজের সাফাইয়ের জন্য আমার কথাটাও তোমায় জানিয়ে রাখি। ভাইয়ের সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বনচে না—উপস্থিত শুনচি সে আদালত করবে, আমাকেও সে উকিলের চিঠি দিয়েছে। তার ন্যায্য গণ্ডা তারে বুঝিয়ে দিতে আমার কোনই আপত্তি নেই, আর সে আপত্তি করলেই বা তা টিঁকবে কেন? কিন্তু কুলোকের কুচক্রে পড়ে ভাই আমার কাছে যা চাচ্চে, তা তার ন্যায্য পাওনার অনেক বেশি। অবিশ্যি ভাইকে দিতে আমার অসাধ নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েদেরও ত তাই বলে পথে বসাতে পারিনে।

তার উপর হেমটার অসুখ লেগেই আছে। ডাক্তার-খরচ করতে করতে জেরবার হয়ে পড়লাম ভাই। অথচ একবার যে দেশ ছেড়ে কোথাও বেরব, তার পর্য্যন্ত জো নেই। তাহলে আমাকে মুলেই হাবাৎ হতে হবে হয়ত—এমনি গুণের ভাই আমার।

মেয়েটারও বিয়ে দেবার সময় হয়ে আসচে। তোমার সন্ধানে যদি ভাল ছেলে থাকে ত দেখো। আমার মেয়ের বয়স যদিও বেশি নয়, কিন্তু এ পাড়াগাঁ—সহরের নিয়ম এখানে খাটে না।

সবার সেরা বিপদ হয়েচে এই যে, আদায়পত্র সব বন্ধ। আমাদের ঘরোয়া বিপদের খবর চারদিকে জানাজানি হয়ে পড়েচে—দেনদারেরা সব ওৎ পেতে বসে আছে—একটা কিছু হেস্তনেস্ত না হলে তারা পয়সাকড়ি দেবে না দেখচি।

এই সব কারণে উপস্থিত টাকা দিয়ে তোমার কোনরকম উপকার করতে পেরে উঠব বলে বোধ হচ্চে না। আশা করি সে জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

কিন্তু হ্যাণ্ডনোট পাঠানো তোমার উচিত হয় নি কোনমতেই। বন্ধুর কাছে টাকা চাইতেও যদি ও-সবের দরকায় হয়, তবে অন্যের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কি? এ বিষয়ে তোমাকে আর বেশি কিছু বলব না—কারণ নিশ্চয় তুমি তোমার অন্যায় বুঝতে পেরেচ, এবং সেজন্য মনে মনে অনুতাপও হচ্চে তোমার হয় ত।

আশা করি তুমি অন্য কোন জায়গা থেকে টাকা পাবে তোমার দরবার অবিশ্যি মিটে যাবে একরকম করে, কেবল মাঝে থেকে আমাকে শুধু লজ্জায় ফেল্‌লে অসময়ে টাকা চেয়ে। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

(গ)

২৫।৩।১০

সতীশ

দেখচি টাকা দিতে পারলে না বলে তুমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েচ এবং বার বার সেজন্য ক্ষমা চেয়েচ, কিন্তু আমার ত মনে হয় আমার কাছে এমন কোন অপরাধ তুমি কর নি যার জন্য ক্ষমা চাইবার দরকার আছে। তোমার বিপদের মধ্যে যে আমার কথা তুমি ভুলে গিইছিলে সেজন্য নিশ্চয়ই তোমার কোন দোষ হয় নি, বরং তাঁরে অন্যায় বলে মনে করলে আমারই অপরাধ হবে এবং তার ক্ষমাও মিলবে না আমার ভাগ্যে।

যদি কোন অপরাধ তোমার হয়ে থাকে তবে তোমার নিজের কাছেই হয়েচে এবং সেজন্য আমার ক্ষমা চাওয়ার কোনই দরকার নেই তোমার। কিন্তু আমার এও মনে হয় যে, নিজের কাছেও তুমি এ-সম্পর্কে কোন অন্যায় কর নি, যদিও আমার চেয়ে সে কথা নিজেই তুমি ভাল বুঝতে পারবে।

বিপদ হয়, আবার কেটেও যায়—কোনটা হয় ত একটু জানিয়ে যায়। তার বেশি কিছু সে করতে পারে না, তবে এটুকু যে করে সে স্বভাবে।

এযাবৎ নিজের উপর দিয়ে এত বিপদ আপদ গিয়েচে যে, ওতে আর অধীর হবার কারণ দেখি নে। তবে ঘাড়ে চেপে পড়লে যে বিপদে আমরা অধীর হয়ে পড়ি, তার কারণ বিপদের ভার তত নয় যত তার ভয়। আমার ত মনে হয়, যে ভার সইতে পারে সে ভার বইতেও পারে—অন্তত ভার যে সে ঝেড়ে ফেলতে পারে তা নিশ্চিত। তবে ভয়ের কথা আলাদা—সেটা মনের। মনে করলে আমরা সেটাকে বভীষিকা করে তুলতে পারি, আবার তারে আদপেই আমল না-দেওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

আশা করি ভগবানের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই সবদিকে মঙ্গল হবে।

তোমার

প্রমথ

পুঃ—ভাল কথা—এখানে এক বন্ধুর কাছে টাকা পাব আশা পেয়েচি যা ভাবতে ভরসা করি নি দেখচি তাই ঘটনায় ঘটে গেল। এমনিই হয়। বিপদ এ মনি ভাবেই আসে, এমনি ভাবেই যায়।

(ঘ)

বেলপুর

২৫শে আশ্বিন' ২২

সতীশ

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারচি নে। হঠাৎ গিরীশচন্দ্র রায়, যিনি তোমার ভাই বলে নিজের পরিচয় দিচ্চেন, তিনি আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট বাবদ সুদে আসলে প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ টাকার একসঙ্গে দাবী ও তাগাদা করে চিঠি দিয়েচেন।

তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার লেন্‌দেন দূরের কথা—জানাশোনা পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এরকম চিঠি পেয়ে তাই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গিইচি।

কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা করবার জন্য তিনি লিখেচেন যে, তোমাদের কারবার পৃথক হবার সময় যে সব খৎপত্র তাঁর ভাগে পড়ে, তারই মধ্যে আমার এই হ্যাণ্ডনোটখানি তিনি পেয়েচেন। সঙ্গে তিনি আবার সে চিঠিখানাও পেয়েচেন, যাতে আমি তোমায় টাকার জন্য লিখেছিলাম, এবং তাতে লেখা মতই এই সময়ে তিনি আমার কাছে টাকার তাগিদ করেচেন।

নিশ্চয় একটা ভুল হয়েচে এর মধ্যে। যদিও তুমি দেওঘর থাকতে আমি টাকার জন্য তোমায় লিখেছিলাম এবং একখানা হ্যাণ্ডনোটও সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে আমি টাকা পাই নি; হ্যাণ্ডনোটখানাও আমি ফেরত চাই নি, কারণ ভেবেছিলাম যে তুমি নিশ্চয় সেখানা ছিঁড়ে ফেলেচ।

তোমার তখনকার সেই চিঠিখানা আমি রেখে দিইছিলাম।

তোমার ভাইয়ের চিঠি পেয়ে তারে খুঁজে বার করেচি। এই সঙ্গে তার নকল পাঠালাম। যদি নিজের ঝঞ্ঝাটে কথাটা তোমার মনে না থাকে, তবে চিঠিখানা পড়ে' নিশ্চয় সব মনে পড়বে। আর সে কথা মনে থাকাও বিচিত্র নয়, কারণ ঘটনা ত বেশিদিনের নয়। তোমার ভাইকে আমি বিশেষ কিছু লিখলাম না। তুমি তাঁরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে—যেন তিনি অকারণে একজন নিরপরাধীকে উদ্ব্যস্ত না করেন। আমি শুধু লিখিলাম যে তোমায় এ বিষয় লিখলাম, এবং তুমিই সব কথা তাঁরে বুঝিয়ে দেবে।

তোমার

প্রমথ

(ঙ)

রাজহাটা

৩০শে আশ্বিন' ২২

ভাই প্রমথ

কি বলে যে তোমার ক্ষমা চাইব বুঝতে পারচি নে, কারণ দেখচি একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েচে এর ভেতরে। কিন্তু ভাগ্যে তোমার হিসেবে হয়েচে আর কথাটা মনে আছে আমাদের, নইলে হয় ত অকারণে একটা গণ্ডগোলের সূচনা হয়ে দাঁড়াত, কারণ টাকাকড়ির কথায় যে কিসে কি হয় বলা যায় না।

তবে ভুলটা যে হতে পেরেচে, সে আমারই দোষ। আমি নিজ-হাতে তোমার হ্যাণ্ডনোটখানা ছিঁড়ে ফেলি নি, গোমস্তাকে বলে-ছিলাম। তারও ভুল হত না, যদি না ঐ তারিখের আর একখানা ঐ টাকার হ্যাণ্ডনোট থাকত

খাতায় দেখচি ঐ তারিখে ৫০০৲ টাকা খরচ লেখা আছে হাণ্ডনোট বাবদ। তবেই বুঝতে পারচ টাকাটা দেওয়া হয়েচে ঠিক, কিন্তু ভুল হয়েচে খৎখানা ছিঁড়বার বেলায়। নিজে হাঁতে ছিঁড়লে আর এ ভুলটা হত না, আমার এ দণ্ডটা লাগত না।

আরও ভুল হল আমার এই যে ভাগাভাগির সময় আমি কোন কথা কই নি। কারণ দেখলেই আমি সব বুঝতে পারতাম, আর টাট্‌কা টাট্‌কা তখন মনেও পড়ত হয় ত টাকাটা কাকে দেওয়া হয়েচে।

তোমার লেখা খৎখানা আমার ভাগে পড়লেও কোন গোল হত না। কিন্তু ভাই আমার নাকি বড় গুণের ভাই—খৎগুলোর মধ্যে যেগুলোর মার নেই সেই গুলোই তিনি নিলেন বেছে। আর আমার ভাগে পড়ল যত সব আদায় না হওয়ার মত ছিল।

যাক্ সে সব কথা বলে আর লাভ নেই। বুঝতে পারচ আক্কেল-সেলামী আমার কম দিতে হচ্চে না। এই দুঃসময়ে এতগুলো টাকা অকারণে দেওয়া কি সহজ কথা—হাত খালি হয়ে যায় একেবারে। কিন্তু দেখচি আমার গোলমালেরই বরাৎ—ভাগের সময় বেশি গেল—ভাই বলে কিছু বলতে পারলাম না; আর এখনও যাচ্চে দফায় দফায় খুতোয় নাতায়—এই দেখ না তোমার এই ব্যাপারটাই তার প্রমাণ।

কিন্তু সে যাই হোক, তোমার কোন ভাবনা নেই আর। গিরীশকে আমি টাকা দিয়ে দেব, কারণ সে আমার এমন ভাই নয় যে বুঝিয়ে বললে কথাটা বুঝবে। তোমার

সতীশ

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

বাঙালী যুবক ও নন্-কো-অপারেশন

—:০:—

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়

এই পাতা কয়টিতে আমাদের কয়েকটি বন্ধুর মনোভাব ব্যক্ত করলুম নন্-কো-অপারেশন সম্পর্কে। 'সবুজে' স্থান লাভের যোগ্য বিবেচিত হলে কৃতার্থ হব। ইতি

ঢাকা—১০,২,২১

নিবেদক

শ্রীঅমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

তরুণ বাঙলার মনোবিকাশের ছন্দটার যদি কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়, তবে সে 'সবুজের' পাতায়। অবশ্যি এ তরুণ শুধু তরুণ নয়, ভাবুকও। তরুণ বলে দাবী আমি করতে পারি, কিন্তু ভাবুক বলে দাবী করবার মত গাম্ভীর্য্য আমার যে নেই সে বিষয়ে শত্রু-মিত্র একমত। তাই পৌষের "সবুজপত্র"-এর বাঙালী যুবকদের

সাথে আমার মনের মিল দেখে ও মতের মিল খুঁজে না পেয়ে, আশ্চর্য্য হবেন না আশা করি।

নন্-কো-অপারেশন প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হবার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা তুফান চলেছে,—কাজের চেয়ে কথার বেশি। তা'তে তলিয়ে গেছেন যেমন অনেক 'Rationalist'—পণ্ডিত মালবীয় ও জষ্টিস্ চৌধুরীর মত, হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেনও তেমনি অনেক 'Nationalist'; তাঁদের উদ্ভিদ বলা যেতে পারে, কারণ ভুঁইফোঁড় বললে হয় ত কলেজ স্কোয়ারে 'সবুজের' জন্যে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী হ'বে। মীমাংসাতে পৌঁছানো ত গেলই না বরং আজ মনে হচ্ছে যে সমস্যাটা আরো বেড়ে গিয়েছে, তার প্রমাণ বাঙলার ছাত্র-সমাজের ভূ-কম্পনটা। এইটেই বোধহয় যথেষ্ট প্রমাণ যে, বাঙালী ছেলেদের ভাবের ধারা ও পৌষের-বাঙালী যুবকদের ভাবের ধারায় মিল নেই মোটেই। আসলে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দু'টির মাঝে তফাৎও খুব কম।

আজ যাঁরা নন-কো-অপারেশনএ বিশ্বাস করছেন না, তাঁদের অনেকেই পনের বছর আগেকার বাঙলার অভিজ্ঞতাটাকে স্মরণ করে "ঘরে-বাইরে"র ভাষা আওড়িয়ে বলতে চান, "উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে দেশের কাজে লাগব না, সমস্ত দেশের ভৈরবী চক্রে মদের পাত্র নিয়েও আমরা বসে যাব না।" কথাটা যতই সত্য হোক্, এ কথাটাও তাঁদের ভাবা উচিত, উত্তেজনা থেকে সরতে সরতে তাঁরা কর্ম্মহীনতার মধ্যে এসে পড়েছেন কিনা। হৈ চৈ-এর ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে কাউকে বলছি নে, কিন্তু যেখানে চুঁশব্দটিও

শোনা যায় না তেমনি স্থানে নিশ্চল ধ্যানে বসে থাকাটা যে আমাদের বদ্ধমূল জড়তার প্রকারভেদমাত্র, এ সন্দেহ হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। সন্দীপ হ'তে এবার কাউকেও ডাকা হয় নি, বরং নিখিলেশের আদর্শকেই এবার বরণ করা হ'য়েছে; তাই "ঘরে-বাইরে"র বুলি কপচানো খুব সুবিধেজনক নয়, বরং বিপজ্জনক-ঢের বেশি। একশ' বছর ধরে এই বাঙালি জাতটা খেতে পায় না যিনি বলছেন, গ্রামের সঙ্গে তা'র সত্যিকার সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে, তিনি বোধ হয় অস্বীকার করবেন না যে, এই জাতটা আরো একশ' বছর দিব্য আরামে এমনি না-খেয়েই চলে যাবে, খেতে পায় না এ জ্ঞানটাও এদের জন্মাবে না, যদি না এসে কেউ এদের বুঝিয়ে দেয় যে, এভাবে টিঁকে থাকাটাই মনুষ্যোচিত নয়। তাই ত "নন্-কো-অপারেশন"-এর দরকার। এতদিন গ্রাম ছেড়ে আমরা চলছিলুম City rabble নিয়ে খেলা করে, এবারকার "নন-কো-অপারেশন" বলছে "Back to village." তাই বুকের উপর দিয়ে স্পেশাল কংগ্রেসটা চলে গেলেও বাঙলার ছেলে সাড়া দেয় নি, দিলে নাগপুর কংগ্রেসের পর। অতীতে হয় ত "প্রকৃত দুঃখকে দূর করবার মোটেই চেষ্টা হয় নি"; কিন্তু একথা আজ আর খাটে না। আসলে Moderate বা Extremist-দের গাল দেওয়াও তেমনি একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, উক্ত দল দু'টির "নানাছন্দে, নানা প্রকারে, গলা উঁচু নীচু করে সুর ধরা যেমনি একটা ফ্যাসান। লজিকের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা আছে তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে, অজন্মা দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব আদি হাজার রকমের দুঃখের বোঝাকে উপরের ভগবান ও নিজের কপালের দোষ বলে মেনে নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ লোক

দিন গুজরাচ্ছে, তাদের কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা করতে হলেই গ্রামে ফিরতে হবে। এবং এই গ্রামে ফেরাটাই নন-কো-অপারেশন-এর একটি অঙ্গ।

(২)

বাঙলা যে অন্যান্য প্রদেশগুলো থেকে পনের বছর এগিয়ে চলছে তার কারণ বাঙালার 'কালচার'। এই 'কালচার'টি তার বিদেশী শিক্ষার মারফত পাওয়া বলে দুঃখ নেই মোটেই, বরং গর্ব্ব আছে। অন্য প্রদেশ যাই বলুক না কেন, আমরা জানি, বিদেশী সভ্যতার অমৃত উপছে গিয়ে গরলই কেবল আমাদের ভাগ্যে ওঠে নি;—সতীদাহের মত সংস্কারগুলোও যার প্রসাদে ঝরে পড়েছে। কিন্তু আমাদের এই 'কালচার'-এর সাথে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যোগাযোগ যে কতটা "সবুজ-পত্র"-এর পাতাতেই অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। M. Sylvian Levy জগতের দোরে আমাদের একটু ভাল সম্বর্দ্ধনার দাবী করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম পেয়েছেন, কিন্তু বাঙলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে বাঙলার কবি কেমনতর পূজা পেয়েছেন তা' কারো অজানা নেই; বিশ্ববিদ্যালয়েরও তা'র জন্যে এক কণা আপ্‌শোষ নেই। তাই, কালচারের দোহাই দিয়ে যাঁরা লেখা-পড়া ছাড়তে নারাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের ক্ষেত্র যে নয় বেশ বলা যেতে পারে, এবং তাদের জন্যে শান্তিনিকেতনের "বিশ্বভারতীর" দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেও খুব বেশি বেয়াদবী হবে না।

তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই, আমাদের কালচারই আমাদের ভারতীয় ইংরেজের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলতে বলছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে একটা মৈত্রীর রাগিণী বেজে উঠ্‌ছে; কিন্তু সে মৈত্রীর ভিত্তিই হল সাম্য। তাই, "আবেদন আর নিবেদন"-এর পালা সাঙ্গ করে আজ যদি বাঙালী হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তা' হলে বলতে হবে যে বাঙালায় কবির গানগুলো 'কানের ভিতরে' যায় নি শুধু, একেবারে গিয়ে 'মরমে পশেছে।' তাই, 'নন-কো-অপারেশন'-এ আমরা 'বয়ে' যাচ্ছি একথা যাঁরা বলতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে, ঘর ছেড়ে ঘরের দিকে ফেরবার নাম বয়ে যাওয়া নয়।

অবশ্যি একথা ঠিক যে, উগ্র স্বাদেশিকতায় কেউ-কেউ মেতে উঠবেন বিদেশকে সকল রকমে বয়কট করবার জন্যে। আসলে তাঁরা fanatics. তাঁদের বেশির ভাগই হবে গেঁয়ে বামুন, ইংরেজী হরপের সাথে যাঁদের পরিচয় হয় নি; অর্থাৎ—যাঁরা 'এরোপ্লেন' যে পুষ্পকরথের নূতন সংস্করণ এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা এখনো গ্রামে বেশ সচ্ছন্দে আছেন, তাঁদের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যেও গ্রামে আমাদের যুবকদের দরকার। বাঙালী যুবকের দল বেশ জানে, লাঙ্কেশায়েরের কলের চিমনিগুলোর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা আমাদের কৃতিত্বের চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজের দিকে পিছন ফেরা আমাদের সৌভাগ্যের কথা নয়। ইংরেজের অন্তরে যে Mammon আছে তাকে আমরা পায়ে ঠেলতে পারি, কিন্তু তাঁর বুক জুড়ে আছে যে Ulysses, তাঁর কাছে আমাদের মতি করতেই হবে।

(৩)

যাঁরা আমাদের সামাজিক ত্রুটিগুলোর দিকে দেখিয়ে আজ বলতে চান, "নিজের ঘর ঝাঁট দাও," তাঁরা বলছেন সত্যিকথা, কিন্তু দেখছেন না যে বাইরে থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়া চলে না। ঘরে আমাদের জঞ্জাল জমা হয়েছে অনেক; কিন্তু তাদের তাড়াতে হলে গ্রামে ফেরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ-সংস্কারের আর রাজনৈতিক অধিকারলাভের চেষ্টা-দু'টির মাঝে যে সম্পর্কটি ছিল তা ঠিক অহি-নকুলের সমান না হোক, কাছাকাছি গিয়েছিল। "নন্-কো-অপারেশন"-এর এবারকার প্রোগ্রামটি নদীর দু'টি পাড় জুড়ে দিয়েছে একটি সেতুতে। অতীতের আর আর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে "নন্-কো-অপারেশন"-এর শ্রেষ্ঠতাই এখানে। "স্বরাজ" লাভের আশায় একদিকে যেমন আমরা জীবনপণ করে লাগব, আর দিকে তেমনি হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়াব কুসংস্কারের বেড়ী ভাঙতে। একদিকে যেমন ভাষাহীন লক্ষ মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, আর দিকে তেমনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে আমাদের লক্ষ লক্ষ 'অস্পৃশ্যদের' আর তাদেরি সামিল সমগ্র ভারতের নারীদের, সাম্য ও স্বাধীনতার বাণীতে 'মানুষের অধিকার' দাবী করবার জন্য। এ বিষয়ে দু'মত নেই।

'Anonymous Russia-র দিকে ফেরাই একমাত্র পন্থা বলে Turgeniv তাঁর "Virgin Soil"-এ নির্দ্দেশ করেছেন। 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর' তফাৎ থাকলেও সেদিনকার রাশিয়ার সাথে

আজকার ভারতবর্ষের তফাৎ বড় বেশি নয়;—কথাটা আমাদের সম্বন্ধেও বেশ খাটে। "নন্-কো-অপারেশন" সেই 'Anonymous India'-র দিকে ফেরার ডাক।

ছাত্র 'নন্-কো-অপারেটার'

মন্তব্য—

এ চিঠিখানি আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে প্রকাশ করছি, কেননা যে সকল যুবক নন্-কো-অপারেশন-ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা ও-ব্যাপারটি কি ভাবে বুঝেছেন তার পরিচয় এ পত্রে পাওয়া যায়।

লেখক ঠিকই বলেছেন। পৌষের সবুজপত্রে যেক'টি বাঙালী যুবকের পত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সঙ্গে লেখক এবং তাঁর বন্ধুবর্গের সঙ্গে ষোলআনা মনের মিল আছে—পরস্পরের ভিতর যা-কিছু প্রভেদ আছে—সে মতের।

বলা বাহুল্য যে, মতের চাইতে মনের-মূল্য ঢের বেশি। মত মানুষের দু'বেলা বদ্‌লাতে পারে, কেননা ও-বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। মত একদিনে গড়া যায় একদিনে ভাঙা যায়, কিন্তু মন জিনিসটি মতের চাইতে ঢের বেশি টেঁকসই অতএব নির্ভরযোগ্য। সুতরাং আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় যে, এ যুগের বাঙালী-যুবকের ভাবের ধারা যুগপৎ উদারতা ও গভীরতা লাভ করেছে, তাহলে তার চাইতে আর আনন্দের কথা কি হতে পারে। আর আমার অনুমান যে অসঙ্গত নয়, এ পত্রও তার অন্যতম প্রমাণ।

পত্রলেখক বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত যুবকদের মতের অমিলও সম্ভবত খুব কম। তাঁর এ কথাও ঠিক। তাঁর সঙ্গে অপর তিনজনের প্রভেদ এইমাত্র যে, তিনি নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে মত স্থির করেছেন, অপর কজন

আজও তা করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু লেখক নন-কো-অপারেশনের যা অর্থ করেছেন সে অর্থে উক্ত মত গ্রাহ্য করতে বোধ হয় অপর ক'জন তিলমাত্রও দ্বিধা করবেন না। নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হলে যে ঘরে ঢোকা দরকার এ-বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই।

সে যাইহোক্, নন-কো-অপারেশনের অর্থ যদি হয় জনসেবা তাহলে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবার নেই।

দেশ-উদ্ধারের যে প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে দেশের পতিত-উদ্ধার, এ মত সবুজপত্র-এ বহুবার প্রকাশিত হয়েছে; সুতরাং দেশের যুবক-সম্প্রদায় যে সেই পতিত-উদ্ধারের ব্রত সোৎসাহে অবলম্বন করছেন এ আমাদের কাছে নিতান্তই আনন্দের বিষয়। আশা করি যে, যাঁরা এ কার্য্যে ব্রতী হচ্ছেন তাঁদের এ জ্ঞান আছে যে জনগণের আর্থিক সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের কোন সহজ উপায় নেই, এবং কোন কার্য্যে সফল হবার জন্য সদিচ্ছাই একমাত্র সম্বল নয়। আমার একথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে এই লোকহিত-ব্রত থেকে নিবৃত্ত করতে চাচ্ছি। তাঁদের এই নব-চেষ্টার ফলে তাঁরা দেশের দুর্দ্দশার problem-টার সমাধান করতে পারুন আর নাই পারুন—problem-টা যে কি তা তাঁরা জানতে ও বুঝতে পারবেন। এ-ও ত একটা মহালাভ। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে-জ্ঞানটি হারিয়ে বসে আছেন সে হচ্ছে reality-র জ্ঞান। এই village organisation-সূত্রে আমাদের যুবক-সম্প্রদায় সেই reality-র সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করবে, যার সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল বকাদের ভাসুর-ভাদ্রবধূর সম্পর্ক।

এ সম্বন্ধে আমার আর একটি মাত্র বক্তব্য আছে। বাঙালীর হাতে পড়ে কংগ্রেসি নন-কো-অপারেশনের খোল নইচে দুই-ই বদলে গিয়েছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবে village organisation-এর নাম-গন্ধ ও নেই। কলিকাতা থেকে নাগপুরে বদলি হয়ে কংগ্রেস নূতনের মধ্যে এইটুকু করেছেন যে, "স্বরাজ"-বিশেষ্যকে, democratic বিশেষণের স্পর্শমুক্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত

চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রমুখ বাঙলা পলিটিক্সের মুখপাত্রেরা বহুচেষ্টাতেও উক্ত democratic শব্দটিকে কংগ্রেসী-স্বরাজের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাতে পারেন নি। যাঁদের কাছে demos অস্পৃশ্য তাঁদের কাছে democratic শব্দ গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। আশা করি আমাদের নন-কো-অপারেশনে যুবক-সম্প্রদায় এ উভয়কেই জাতে তুলে নিতে কৃতকার্য্য হবেন।

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য

—:০:—

পৌরাণিক যুগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এবং লোকাচারের সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মধ্যে যখন আমাদের জীবন অতিবাহিত হত, তখন প্রকৃতিকে আমরা ভাববিহ্বলচিত্তে দেখতুম, এখন সে দিক হতে না দেখে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অভিব্যক্তির দিক হতে দেখে থাকি। ভক্তির চন্দনপ্রলেপে এবং কুসুমঅর্ঘ্যে স্ব-এর-অধীন জ্ঞানপথ পৌরাণিক যুগে আচ্ছন্ন হয়ে এক রকম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ; ধূপ ধুনোর গাঢ় বাষ্প ভেদ করে দেবতাকে দেখবার আশা অদ্বিজ জনসাধারণের ত্যাগ করতে হয়েছিল ; পুরোহিতের পিছন থেকে মন্দিরের দ্বারদেশ হতেই দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই তখন তাঁদের তৃপ্ত থাকতে হত।

কিন্তু ছাঁচে-ঢালা ব্যবহারের-জন্য-প্রস্তুতরূপে সত্যদেবতাকে জগতে কোথাও পাওয়া যায় না ; জগতে আমরা তাঁর প্রকাশই দেখতে পাই, সত্য নানা রূপে জগতে দিন দিন এইরূপেই অভিব্যক্ত হচ্ছেন। প্রকৃতিকে বিশ্বাত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্ত মূর্ত্তিও বলা যেতে পারে।

সেই জন্য সাহিত্যে, অন্তঃপ্রকৃতিকেও আমরা এখন অন্য দিক হতে দেখি। এখানে দেখতে পাই, প্রাণশক্তি মনের অজানা দেশ হতে উদ্ভাসিত হয় এক একটি বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষায়, এক একটি প্রবৃত্তির বিচ্ছুরণে। জীবন, এইরূপে মহাকাব্যের ন্যায়, অধ্যায়ে অধ্যায়

প্রকাশিত হয়। আকাঙ্খার স্ফুরণে আমরা এখন আর বিমূঢ় হই নে বিস্মিত হই নে শঙ্কিত হই নে, বরং তার মধ্যে আমরা বিশ্বজনীন আত্মাকে জানবার এবং লাভ করবার চেষ্টা করি। এই বিশ্বাসও আমাদের দৃঢ় হয়েচে যে, সে শক্তির মূলে সত্য আছে। চিৎ-শক্তির দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্খাসকল পরিচালনা করতে পারলে তারা সমাজের অনিষ্ট না করে হিতসাধন করেই তাদের অন্তঃনিগূঢ় সত্য প্রমাণ করবে।

প্রকৃতির এই সত্য আমরা বিশেষভাবে পেয়েচি শ্রীরবীন্দ্রনাথের আজীবন সাহিত্যের সাধনায়। তিনি মনোজগতের কি অসংখ্য শক্তিই না আবিষ্কার করছেন এবং তাদের চিৎশক্তির দ্বারা পরিচালিত করে আমাদের জীবন গঠন করছেন, এই জন্যই আমরা তাঁকে যুগ-কবি বলতে পারি।

(২)

শ্রীরবীন্দ্রনাথের জীবনকে তিন অঙ্কে লিখিত একখানি অপূর্ব্ব নাটক বলা যেতে পারে। প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েচে "ক্ষণিকায়"। এই সময় দেখতে পাই তিনি ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আপন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় একটি আত্মগত মনের বিচিত্র আকাঙ্খার উত্থান পতন নির্নিমেষ নেত্রে দেখছেন এবং কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নাটকে গানে তাদের বিচিত্র গতির ইতিহাস লিখে রাখছেন। কি বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশিষ্ট মনের বিকাশ এবং সেই মনটিই বা কি বিশাল! একদিকে বাস্তবজীবনকে তার সত্য আকারে সত্য বর্ণে দেখবার অশ্রান্ত চেষ্টা, অন্যদিকে তাই আবার বাক্য-মনের অতীত অসীমের

বিপুল প্রাণ-প্রবাহে আনন্দহিল্লোলে হিল্লোলিত করে তোলা। একদিকে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সকল মহৎ ভাবের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত, অন্যদিকে হৃদয়তন্ত্রী গানে গানে ঝঙ্কৃত।

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় দেখতে পাই, কবি অন্তরের নির্জনতা হতে বের হয়ে বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য চঞ্চল হয়েছেন; ক্ষণিকার পর যৌবন তরীকে বিদায় দিয়ে কবি কল্যাণের আদর্শ নিয়ে বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ এইখানে।

এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর দ্বিতীয় অঙ্কের সামাজিক ভাবেরই আলোচনা করব। এবং দেখব যে, যখন তিনি বাঙলার এবং ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান তখনই তাঁর অলক্ষ্যে দিব্যশক্তির অনুপ্রেরণায় তিনি তৃতীয় অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন—বিশ্বমানবের মিলন ঘটিয়ে তুলবার জন্য।

(৩)

তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন "উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি"তে বাঙলা এবং ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, শস্যশ্যামলা সোনার বাঙলার এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী ভারত-মাতার অসহায় সন্তানগণের উদরের অন্ন ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠছিল, দুর্ভিক্ষে এবং মহামারীতে ভারতবাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, মহারাণীর ঘোষণাপত্রে বিশ্বাস, ইংরাজি ভাষায় বাকপটু শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অন্তরেও শিথিল হয়ে আসছিল এবং গবর্ণমেণ্টের

মাঝে মাঝে অনাত্মীয় আচরণে তাঁদের এই উপলব্ধি হচ্ছিল যে, খৃষ্টের ধর্ম্ম কিম্বা মিল বেন্থামের দর্শনে শাদায় কালোয় ভেদ না থাকলেও, খৃষ্টান-ইংরাজের আচরণে স্পষ্টই এবং প্রত্যহই সে ভেদ দেখা যায়। তখন এশিয়া এবং আফ্রিকার দুর্ব্বল জাতিগণকে গ্রাস করবার চেষ্টায় য়ুরোপের প্রবল জাতিগণের মধ্যে প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়েছিল; তখন প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছিল, আমাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করতে সমর্থ এমন কোন প্রবল ক্ষাত্র শক্তি না থাকাতে আমাদের এই আশঙ্কা প্রতিদিনই বাড়ছিল যে, য়ুরোপ বুঝি বা আমাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি যদিও, যে সকল উপাদানে গঠিত, তাতে ললিত-কলার প্রতি অনুরাগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; কিন্তু আমাদের জীবনের এই সত্য ঘটনাটি তাঁকে তাঁর অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় শান্তিতে বীণাপাণির সেবা করতে দেয় নি; বাস্তব জীবন, সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম নিয়ে প্রতি দিনের প্রত্যক্ষ জীবন;—অপমান, অনাহার, শত লাঞ্ছনা নিয়ে যে ত্রাসরুদ্ধ জীবন তা কবির চিত্তকে আঘাত করেছিল, মথিত করেছিল, তাঁর কল্যাণ-প্রথিষ্ট ইচ্ছা-শক্তিকে ত্যাগ-শক্তিকে উদ্বোধিত করেছিল। সংসারের লাভ ক্ষতির দিকে, মান অপমানের দিকে, রাজশক্তির সন্তোষ অসন্তোষের দিকে দৃক্‌পাত না করে "ওঁ পিতা নোঽসি" অঙ্কিত ধ্বজা নির্ভয়চিত্তে, আনন্দমনে বহন করে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।"

ইহাই হয়েছিল সাধকের মূল মন্ত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বঙ্গদর্শন' এক সময়ে আমাদিগকে বাঙলা সাহিত্যে অনুরাগী করেছিল, সেই 'বঙ্গদর্শন' নব-পর্য্যায়ে তাঁর সম্পাদকত্বে পুনরায় প্রকাশিত হল। ইংরাজের শাসনে এবং ঘরে-বসে-পাওয়া পাশ্চাত্য ভাবের উপদ্রবে আমাদের জীবন একটা অস্পষ্ট কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করেছিল—শ্রীরবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে আমাদের হৃদয়ের আবেগসকল সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ হতে আরম্ভ হল। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি, না জেনে আমাদের patriot-গণ কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতেন, সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা করতেন, ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারকগণ ভারতের উদ্ধারের আশা নেই মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়, (যেখানে একমাত্র মাতৃভাষা ভিন্ন সকলই শিখান হয়) বিশৃঙ্খলভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন কণ্ঠস্থ করবার আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতেন।

এ অবস্থায় একমাত্র সাহিত্যের সাহায্যেই শ্রীরবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবন গঠন করতে হয়েছিল। আত্মশক্তির এ কি অলৌকিক উন্মেষ!

(৪)

যে সকল বাইরের ঘটনা সে সময়ে ঘটেছিল, তার মধ্যে 'সম্রাট-নায়েব' লর্ড কার্জ্জনের রাজনীতি, তাঁর দিল্লীর দরবার এবং বঙ্গ-বিভাগই বাঙালীর এবং ভারতবাসীর অন্তরে সর্ব্বাধিক আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু কবি দ্বিধা-বিভক্ত বাঙালীর মুমূর্ষু চিত্তকে আনন্দে সঞ্জীবিত এবং শতধা বিভক্ত বাঙালী মনকে—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্"

মন্ত্রে দীক্ষিত করে একই ভাববন্ধনে বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন।

"বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্ সত্য হউক্ সত্য হউক্ হে ভগবান।"

এই প্রার্থনার আনন্দে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের অস্পষ্ট জীবন এই রূপেই তাঁর দ্বারা স্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করেছিল।

যে জগৎ আমাদের অন্তরে বাহিরে রয়েচে তা একদিকে যেমন দেশ এবং কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে বিরাট প্রাণশক্তি জড়ের বাধা ভেদ করে অভিব্যক্ত হতে হচ্চে বলে সেই জগতে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। মানুষকেও প্রতিদিন অগ্রসর হতে হচ্চে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে, তার বিশ্বাস দৃঢ়, চরিত্র বলবান হচ্চে শক্তির সংঘর্ষণ সহ্য করবার সামর্থ্যে। একদিকে ছোট ছোট আত্মসুখান্বেষিনী প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা অবিরাম করে থাকে, অন্যদিকে এ-ও সত্য যে, মানুষের প্রকৃতিতেই এমন এক পুরুষ নিত্য বিরাজ করছেন, যার জন্য সে মনুষ্যত্ব লাভ করে মহৎ হতে ব্যাকুল হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভায়।

"রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।"

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহা জীবনে চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যু তারণ শঙ্কা হরণ দাও সে মন্ত্র তব।"

সমাজের কল্যাণ এবং আত্মার কল্যাণ বিষয়ে তাঁর চেতনা সকল সময়েই জাগ্রত ছিল বলে তিনি প্রকৃতি-রাজ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী জেনেও কল্যাণ-ভ্রষ্ট হন নি। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধে, "চোখের বালি," "নৌকাডুবি" প্রভৃতি উপন্যাসে একদিকে সেইজন্য দেখা যায় অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কল্যাণের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তাঁর গানে উপলব্ধি করি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেও দেশ কালের সীমার মধ্যে তাঁর আত্মাকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি; কর্ম্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, এই দুটি ধারা পরস্পরকে ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা অভিব্যক্ত করতে করতে তাঁরই দিকে চলেছিলেন যিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। কোনো দেশাচারের কিম্বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আক্ষরিক আনুগত্যে পরিচালিত হয়ে নয়, একমাত্র অন্তর্য্যামিনী চিৎশক্তির দ্বারাই তিনি হৃদয়ের বিচিত্র শক্তিসকল পরিচালনা করেছিলেন। ইহাকেই আমরা যথার্থ স্ব-এর অধীনতা বলতে পারি। এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে আত্মার এই স্বাধীনতার উপলব্ধিই তাঁকে বিশ্ব-বরেণ্য করেচে। আমাদের সাধনা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এবং ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়েচে।

(৫)

সাহিত্যই হোক, বিজ্ঞানই হোক, আর ধর্ম্মই হোক—জাতির

সর্ব্বজনীন চেতনা এবং উপলব্ধির মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা নেই, তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না, কল্যাণকরও নয়।

নবযুগের বাঙালী-সভ্যতা জন্ম গ্রহণ করেচে একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায়—রামমোহন যাকে বিবেক এবং বৈরাগ্যে দীক্ষিত করেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহময় ক্রোড়ে লালন পালন করেছিলেন। যুগ-কবি সেই সময়েই ভূমিষ্ট হন যখন হিমালয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করছিলেন, যখন তাঁর আত্মা ব্রহ্মোপলব্ধির দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

নবযুগের বাঙালী-সভ্যতা শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তিতে প্রতিভায় যৌবন লাভ করে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেচে। কি এক সুদূর আশার পানে প্রহরের পর প্রহর অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে, প্রাণের প্রতি নিশ্বাসে, কামনার প্রতি লহরে ইহা সেই সুদূরের পানেই যুগ-কবির অধিনায়কত্বে চলেচে, ইহা একদিকে নানা রসসম্ভোগের আকাঙ্খায় চঞ্চল, জগতে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, অন্যদিকে—

"ঘাটে বসে আছি আনমনা।"

বলে জীবনসমুদ্রের এ তীরে একা বসে আছে।

"সে বাতাসে তরী ভাসাব না
যাহা তোমা পানে নাহি বয়।"

ইহাই এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকের সঙ্কল্প। এ সঙ্কল্প যুগ-কবিই বাঙালী সভ্যতাকে দিয়েছেন এবং তার উপর বিশ্বাত্মার শীলমোহরও স্পষ্ট পাঠ করা যাচ্চে।

কিন্তু এর পথ কুসুমাস্তৃত নয়। একে প্রতিপদ অগ্রসর হতে হচ্চে তিন তিন্‌টা শক্তির সহিত সংগ্রাম করে। প্রথম সংগ্রাম করতে হচ্চে, এবং জয়ী হয়ে আত্মসাৎ করে নিতে হচ্চে পৌরাণিক যুগের সমাজশাসনযন্ত্রটিকে। দ্বিতীয়, আস্তিক্যবোধহীন "কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক যারা বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে" ভারতবর্ষের সনাতন প্রকৃতি হতে বিচ্যুত হওয়াতে, তাদের "চরিত্র ভগ্ন বিকীর্ণ, তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ"। তৃতীয়, ভারতবর্ষের, কি দেহ কি আত্মার সহিত লেশমাত্র নাড়ির যোগ নেই যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তার সঙ্গে।

যে যন্ত্রের দ্বারা পৌরাণিক যুগে সমাজ শাসিত হত, সেই যন্ত্র এখন আমাদের স্বার্থের অনুকূল নয়, এইজন্য যে তা অপেক্ষাও একটি প্রবলতর যন্ত্রের, শক্তিশালী জাতির এবং সভ্যতার সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা বেধে গেছে। আমাদের আত্মবোধ যে মাঝে মাঝে জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তার কারণ আমরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায় বহুদিনের অভ্যাসে নানা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলেছেন, নবযুগের আদর্শ এরা এখনো গ্রহণ করে জাতিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে সাহস করছেন না, সমাজের নারী-শক্তিকে এখনো বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে কল্যাণসাধন করবার স্বাধীনতা, গুণ এবং কর্ম্মের বিচার দ্বারা মানুষের প্রাপ্য মর্য্যাদা মানুষকে দিচ্ছেন না। এইজন্যই এ যন্ত্র স্বার্থের, আত্মরক্ষার অনুকূল নয়।

তারপর "শিক্ষাচঞ্চল যুবক"-সম্প্রদায়, যারা বিশ্বের অমিত্র ঋষির প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্য অবস্থান করছেন এবং সকল প্রকার মহৎ ভাবকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, আত্মশক্তিতে

বিশ্বাস নেই; কেবল সুযোগের অপেক্ষায় কাতরনেত্রে বিশ্বের অমিত্র ঋষির পানে শূন্যে হতে চেয়ে আছেন।

রাজশক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। রাজাই সমাজের প্রাণ অর্থ জ্ঞান শক্তি প্রতিভা রক্ষা করেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ইতিহাসের একটা প্রহেলিকা। সমাজের স্বার্থ এবং বিশিষ্টতা রাজশক্তিই রক্ষা করেন। কিন্তু রাজশক্তির সহিত ভারতের নাড়ির যোগ যে আছে, এ কথা কেউ বলতে পারেন না; হৃদয়ের যোগ, ভারতের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য চির জাগ্রত ইচ্ছা, যুগ-কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথও সকল সময়ে দেখতে পান নি।

এই সকল শক্তির নিত্য সংঘর্ষণের ভিতর দিয়ে যুগ-কবিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্চে—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম-এর দিকে। এইজন্য তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই কবির রসতন্ময়, ভাব-বিহ্বল প্রকৃতি হলেও, কর্ম্মজীবনের ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র এই সময়ের সাহিত্যে যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়েচে, ভাব-রস-বিহ্বলতা তত নয়। তাঁর প্রতিভায় এমন একটি গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব হল যার মধ্যে আছে একদিকে প্রাচ্যের আস্তিক্য-বোধ, অন্যদিকে প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী; একদিকে আমাদের প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা, অন্যদিকে কর্ম্মীর কর্ম্মকুশলতা। একদিকে ছন্দের গতি-বৈচিত্র্য, অন্যদিকে গদ্যের গাম্ভীর্য্য পাশাপাশি নয়, একই কালে অখণ্ডভাবে দেখা যায়।

তখন কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে, তিনি বুঝি বাঙলা এবং ভারতবর্ষকে পৌরাণিক যুগের কোনো একটি ছাঁচে ঢেলে গড়বার সঙ্কল্প করেছেন। "স্বদেশী সমাজ" পাঠ করে অনেকের মনে এইরূপ

আশা হয়েছিল ; কিন্তু প্রতিভার দৃষ্টি সম্মুখে, মানুষের চক্ষু তার কপোলের অস্থিতে, পশ্চাৎভাগের মস্তিষ্কের খুলিতে নয় ;—প্রতিভা সৃজন করে, নকল করে না।

যুগ-কবির কর্ম্মজীবনের সহিত বোলপুরের "শান্তি-নিকেতন"-এর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। নিশ্চিন্ত মনে, সুস্থদেহে, পারিবারিক জীবনের শান্তি এবং আনন্দ ভোগ করবার সৌভাগ্য হতে তিনি যতই বঞ্চিত হচ্ছিলেন, "প্রয়োজনহীন বিপুল রিক্ততার মাঝখানে স্নিগ্ধচ্ছায় আশ্রম"টি এবং তার স্নেহময়ক্রোড়ে "বিদ্যালয়"টি ততই প্রিয় হয়ে উঠেছিল

আমাদের সনাতন আদর্শটি কি?—কেবলমাত্র নিয়ম পালন নয়। সে ত একটা বাইরের ঘটনা। "নব বর্ষ" প্রবন্ধে সাধক বলছেন, "কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করে রাখা, প্রকৃতির চির নবীনতার ইহাই রহস্য।"......"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।"

ভারতবর্ষ একদিকে কর্ম্মী, অন্যদিকে নির্লিপ্ত যোগী! আত্মাকে একদিকে লাভ করতে হবে ইহার বহির্ম্মুখী শক্তির বিকাশে, অন্য দিকে তাহাদিগকে বাইরের বৈচিত্র্য হতে গুটিয়ে এনে একের ধ্যানে, একের সমাধিতে।

এইজন্যই রামমোহনের সম্বন্ধে Miss Collet যা বলেছেন, শ্রীরবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বলতে পারি, "If we follow the right line of his development we shall find that he leads the way from the orientalism of the past, not to but through Western Culture towards a Civilization which is neither Western nor Eastern but something vastly larger and nobler than both."

(৬)

৭ই পৌষ এবং ১১ই মাঘের উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সে সকল আমাদিগকে দেখিয়ে দেয়, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা এবং তার প্রবল গতি। মানুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন না শক্তিশালী হউন, বিশ্বপ্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তি সংঘর্ষণের মধ্যে তাঁর অবস্থা কি অসহায়। সেইজন্য যিনি "সম্রাট-নায়েব" কার্জনেরও ভ্রুকুটীতে ভীত হন নি, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার চরণে কাতর প্রার্থনা করছেন "নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী।"

কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীরবীন্দ্রনাথকে পৌরাণিক বিধি-নিষেধের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রদায়সকল তাঁদের মধ্যে লাভ করেও কেন যে তাঁদের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি, তার কারণ, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিশিষ্টতা এবং দ্রুতগতি। তাঁর মধ্যে যে বৈরাগ্য দেখা যায় তা পৌরাণিক সমাজের বাস্তব জীবনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ঔদাস্য নয়—

"জড়তা হতে নবীন জীবনে, নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমাহতে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে।"

কিন্তু এই নব-জন্ম সাধককে লাভ করতে হয়েচে দুঃখকে নত মস্তকে কোন রকমে বহন করে নয়—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে!
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!
যেমন করে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে!"

সাধকের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, "আবিরাবীর্ম্ম এধি। হে আবিঃ তুমি আমার কাছে আবির্ভূত হও। হে প্রকাশ তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও; এ প্রকাশ ত সহজ প্রকাশ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়াই তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া ওঠে। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

প্রভাতের আলোক, আকাশের নীলিমা, বসুন্ধরার শ্যামলতা, ভাগীরথীর হীরা বসানো তরঙ্গমালা এখন কবির নিকট জড়শক্তির প্রকাশমাত্র নয়, তাই কবি গাইছেন—

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে!
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে!
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে।"

(৭)

যে সকল ভাবের উপলব্ধির উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপিত, ভক্ত-কাবর অসংখ্য সঙ্গীতে সেই সকল ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি কখনো তাঁকে সখাভাবে উপলব্ধি করে গাইছেন, "চির সখা, ছেড় না মোরে, ছেড় না," কখনো তাঁর অনন্ত অসীম শক্তি দেখে বল্‌ছেন—

"হে মহা প্রবল বলী,
"কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য!"

আবার কখনো বা তাঁর মাতৃভাব উপলব্ধি করে গান করছেন—

"জননি, জীবন জুড়াও প্রসাদ সুধা সমীরণে"

কখনো তাঁর পিতৃভাব নিরীক্ষণ করছেন—

"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে
চল যাই, চল চল চল ভাই।"

কখনো মধুর ভাবে—

"একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে!"

কখনো দাস্য ভাবে—

"পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

আবার কখনো বা তাঁর স্তব্ধভাব দেখছেন

"জাগ্রত বিশ্বকোলাহল মাঝে, তুমি গম্ভীর
স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।"

(৮)

সান্ত মানবাত্মায় অনন্তের প্রকাশ এইরূপেই বিচিত্রভাবে হয়ে থাকে, ভক্তের জীবনে একি এক আশ্চর্য্য ঘটনা—"কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়!" আমাদের মত বিষয়ের ভারে যারা ভারাক্রান্ত, তাদের উৎসাহ দিয়ে কবি গাইছেন, "শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ পথ প্রান্তে বসে একি খেলা!" তাই বটে। কিন্তু এ শ্রান্তি যে মর্ম্মান্তিক আমাদের ইহা সত্যই সব সময়ে মনে থাকে না—

"আমার প্রাণ তোমারি দান"

তাই আমাদের চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গান গেয়ে ওঠে না—

"তুমিই ধন্য, ধন্য হে।"

(৯)

আমরা দেখলুম সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন অভিব্যক্ত হয়েচে। সামাজিক জীবন ভারতের চিত্তকে তার অধীন করে, সাম্প্রদায়িক মোহে আচ্ছন্ন করে ইহা তত সত্য নয়, যত সত্য সে সাধকের চিত্তকে ভগবৎ প্রেমে জাগ্রত করে তাঁর মনকে স্তরে স্তরে বিশাল হতে বিশালতর জীবনের মধ্যে নিয়ে যায়। বালক ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কেবলমাত্র অনুভব করে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের স্থূল জগৎ, সাধক তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট উপলব্ধি করেন একদিকে আকাঙ্ক্ষাময়ী প্রকৃতিকে, অন্যদিকে তাঁর অধিষ্ঠাত্রী পুরুষকে।

অসংখ্য ভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেও ভক্ত কবি দেখছেন যে, তাঁর মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যাকে কোনো নামের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করা যায় না, অথচ তার অস্তিত্ব অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ তাঁকে একমাত্র "তুমি" ছাড়া আর কোনো ভাবেই প্রকাশ করতে পারেন নি, আমাদের সাহিত্যে এই ভাবটি সম্পূর্ণ নূতন, ইহা যুগ-কবির বিশেষ দান। একটা অস্পষ্ট বেদনা এর সঙ্গে জড়িত আছে, যার আভাস উপনিষদে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এ অস্পষ্টতা অজ্ঞানীর অস্পষ্টতা নয়, এ যে সীমার মধ্যে অসীমের

আত্মঘোষণা! এ অস্পষ্টতার মূল তিনিই, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত।

অথচ তাঁকেই বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং আমাদের হৃদয়ের তারে তারে আঘাত করতে দেখে কবি বলছেন—

"সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে!"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

——